শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত

ব্রজধাম দর্শন

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক
সম্পাদিত

কলিকাতা
১৩৫৪

প্রকাশক ঃ শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সেক্রেটারী,
মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা।
মুদ্রাকর ঃ শ্রীবলাই চরণ ঘোষ, ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
৭৯-এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থ লিখন ঃ ১লা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৪।
গ্রন্থ সমাপন ঃ ৮ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৪।
লিপিকার ঃ শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল।
গ্রন্থ মুদ্রণ ঃ ২০শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৫৩।
গ্রন্থ প্রকাশন ঃ ৭ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৫৪।

মূল্য ঃ দেড় টাকা।

আমার পরম শ্রদ্ধেয়া

শ্রীমতী নীরদবরণী দেবী

শ্রীযুক্ত মানস প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের

মাতার প্রতি

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

দোল-পূর্ণিমা ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৩

নিবেদন
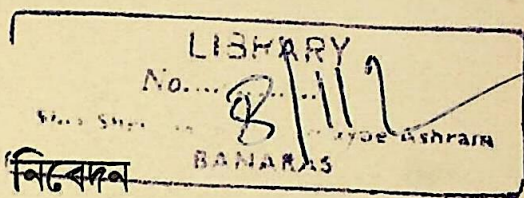
এই পুস্তক প্রকাশনায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক ও শ্রীযুক্ত মানস প্রসূন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক সাহায্য না পাইলে পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। তাঁহারা বহু চেষ্টায় এবং অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। বহু বাধা বিপত্তির মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল এবং যে সমস্ত বন্ধু আমাদের এই পুস্তক প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

জন্মাষ্টমী, ৭ই ভাদ্র
সন ১৩৫৪।

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

পরিচয়
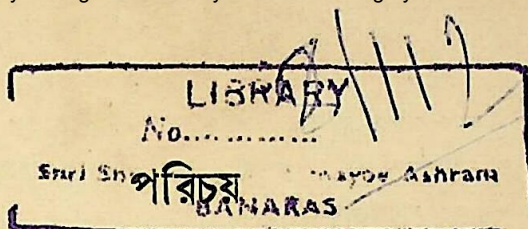
বর্ত্তমান গ্রন্থটি কোন ভ্রমণ কাহিনী বা ইতিহাসের কথা নয়; ইহা চিন্তার কথা—অনুভূতির কথা--দর্শনের কথা। শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার গোবর্দ্ধন প্রভৃতি তপোভূমি ও তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রে নিজে যা দর্শন করেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন, ইহা তাহারই আভাস মাত্র। শাস্ত্রের 'তীর্থ মাহাত্ম্য', 'অনাদি লিঙ্গ', 'মাধুর্য্য,' এবং 'নিত্য ও লীলা,' 'শান্তি', 'গুণবদ্ধ ও গুণাতীত জ্ঞান' আমাদের কাছে যা শুধু শোনা কথা মাত্র, গ্রন্থকার সে সবের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

গ্রন্থকার বৈষ্ণব শাস্ত্রের সামীপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য, সাধিষ্ঠ, সার্ষ্টি প্রভৃতি ছয়টি অবস্থার ভিতর দিয়া মন কিরূপে উর্দ্ধগতি লাভ করে এবং সাধারণ অবস্থায় অবতরণ করে তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মন ছয়টি স্তরে বিভক্ত। ইষ্টলাভে সাধককে এই ছয়টি অবস্থা ক্রমে ক্রমে অতিক্রম ক'রতে হয়। ভক্তি সম্বন্ধে বলেছেন, "ভক্তি,—নিস্তেজ হতাশ মুমূর্ষু ভাব নয়। ভক্তির মধ্যেও গাম্ভীর্য্য ও তেজস্বিতা আছে।" আরও বলেছেন যে, ব্রহ্ম বা শান্তি লাভে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা রেখা দেওয়া নাই।

গ্রন্থকারের আরও নানা বিষয়ক রচনা অপ্রকাশিত প'ড়ে আছে। সে সব প্রকাশিত হ'লে দেশের ও সমাজের অনেক সমস্যার সুসমাধান হবে ব'লে আমার মনে হয়। তাঁর দর্শন ও ভক্তি সম্বন্ধে অপর গ্রন্থগুলি পড়লে ধারণা হয় যে, তাঁর অনুভূতি-রাজ্যের ভাব-সম্পদ জগতে পরিবেশন হ'লে জাতির মহাকল্যাণ হবে।

ভাষা ও শব্দ আকার ইঙ্গিত মাত্র—ইহাতে মূল বিষয়-বস্তুর অতি সামান্যই প্রকাশ পায়। সুতরাং ভাষা ও শব্দে কোনও কিছুর পরিচয় সম্পূর্ণ করা সাধ্যাতীত।

গ্রন্থকার আমাদের আন্তরিক স্নেহ ক'রে থাকেন। সেই পরম স্নেহবশে আমার মত অযোগ্যের হাতেও এই পুস্তক সম্পাদনার ভার তুলে দিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু সর্ব্বদাই ভয় হয় যে, অপটু হাতে রূপ দিতে গিয়ে হয়ত কত ত্রুটী বিচ্যুতিই না থেকে গেছে। তবে ভরসা আছে, সুধী পাঠক পাঠিকাগণ নিজগুণে আমার এই অক্ষমতাকে মার্জ্জনা ক'রে নেবেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলে রাখি—এই গ্রন্থে উদ্ধৃত গান ও কবিতাগুলি অধিকাংশই শ্রদ্ধেয় ৺গিরিশ চন্দ্রের রচনা হইতে উদ্ধৃত।

জন্মাষ্টমী, ৭ই ভাদ্র
সন ১৩৫৪

বিনীত—
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক

ব্রজধাম দর্শন

বৃন্দাবন অবস্থানকালে একবার কথা হইল যে, আমরা নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা দর্শন করিতে যাইব। কোন্ বৎসর ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় ইংরাজী ১৯১৩ বা ১৯১৪ সাল হইবে। কালাবাবুর কুঞ্জ ও সেবাশ্রম * হইতে আমরা কয়েকজন বিশেষ পরিচিত লোক একত্রে যাইতে ইচ্ছা করিলাম। বুড়োবাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ), শ্রীশ (স্বামী ধীরানন্দ), কানাই (স্বামী অনন্তানন্দ), আমি এবং অনেকগুলি পুরীর লোক বৃন্দাবন হইতে মথুরায় ও মথুরা স্টেশন হইতে ট্রেনে করিয়া কসি স্টেশনে নামিলাম।

যাত্রা পথে—

কসি হইতে ছোট একটি রেল লাইন নন্দগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা রেলপথেই গেলাম, কারণ হাঁটাপথে বা গোযানাদিতে গেলে সময় এবং ভাড়া বেশী লাগে। যাহা

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত বাগবাজারের ৺বলরাম বসুদের বৃন্দাবনে একটি ঠাকুরবাড়ী তাঁহার পিতামহের কাল হইতেই আছে। ঐ ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বপ্রথম ম্যানেজার কালাবাবু নামীয় কেহ ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ ঠাকুর-বাড়ীর নাম 'কালাবাবুর কুঞ্জ'।

হউক, আমরা দলবল লইয়া কসি স্টেশন হইতে ছোট লাইন দিয়া নন্দগ্রামের দিকে চলিলাম। নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা লালাবাবুদের জামিদারীভুক্ত * বলিয়া তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের আনুকূল্যে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। নন্দগ্রাম হইল শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দরাজার গ্রাম। এই জন্যই ইহা নন্দগ্রাম বলিয়া খ্যাত।

আমরা ট্রেন হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন বেলা দুইটা কি তিনটা হইবে। প্রশস্ত মাঠ, এবং মাঝে মাঝে গাছ। এই গ্রাম দর্শন করিতে যাইবার সময় আমরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম জপ করিতেছিলাম। আমাদের অন্তরে যে সকল ভাব বহুকাল সঞ্চিত ছিল, অলক্ষিতে সেই সকল প্রদীপ্ত হইয়া চিত্তকে আলোড়িত করিয়া একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সকলেই সেই মাঠ, সেই গাছ, সেই ঘাস দেখিয়া অল্পবিস্তর বিমোহিত হইল। ছেলেবেলায় দিদিমা, ঝি-মার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যে সব গল্প শুনা গিয়াছিল, কথকদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল বর্ণনা নিবিষ্ট মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া শুনা গিয়াছিল, এখন সেই সকল লীলাস্থান প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। মনে এক অপূর্ব্ব ভাব ও আবেশের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং অল্পক্ষণেই সকলে বিমোহিত ও তন্ময়

* পাইকপাড়ার বিখ্যাত ভক্ত জমীদার লালাবাবুর বৃন্দাবনস্থ ঠাকুরবাড়ীকে "লালাবাবুর কুঞ্জ" বলা হয়। বৃন্দাবন-মথুরা অঞ্চলেও ইঁহার জমিদারী রহিয়াছে।

হইয়া পড়িলাম। আমরা মাঠ দিয়া যাইতেছি এমন সময় সহসা এক পাল হরিণ আসিয়া আমাদের গা ঘেঁসিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল—কোন ভয় বা সঙ্কোচ নাই! আমরা চমকিয়া উঠিলাম, কারণ এটি নূতন দেখিলাম যে, বনের হরিণ মানুষকে ভয় করেনা বরং গা ঘেঁসিয়া চলিয়া যায়। আমরা নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় সেই হরিণের দলটা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আমাদের গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল; যেন কত পোষা হরিণ, আবদার করিয়া করিয়া মানুষের গায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। দেখিলাম তথায় হিংসা ভাব না থাকায় পশুরা মানুষকে ভয় বা সঙ্কোচ করে না। একটা নূতন জিনিষ যেন চোখের উপর ঠেকিল। প্রথম যেমন একটু সঙ্কোচ ও বিরক্তির ভাব আনিয়াছিল, সেটা চলিয়া গিয়া আর এক ভাব আসিল যে, হিংসা ভাব না থাকিলে জগৎকে অন্যভাবে দেখা যায়—নূতন ভাব, নূতন দেশ, নূতন জগৎ; সবই যেন মধুময় হইয়া উঠিল।

অল্পদূর গিয়াছি, এমন সময় দেখা গেল দলে দলে ময়ূর মাঠ দিয়া চলিতেছে। আমরা মাঠের যে যে পথ দিয়া যাই, তাহারা সেই সেই পথ দিয়াই দলবদ্ধভাবে চলে। ক্রমে আমাদের যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিল, কাজেই আমরা খানিকটা ঘুরিয়া অন্য পথ ধরিয়া চলিতে বাধ্য হইলাম। পশুপক্ষী মানুষকে দেখিয়া ভয় বা সঙ্কোচ করেনা, প্রথমতঃ এ একটা নূতন দৃশ্য! আবার মনে হইতেছিল এই মাঠে শ্রীকৃষ্ণ এক সময় গরু

চরাইয়াছিলেন,—সেই মাঠ, সেই গাছ, সেই ঘাস, সেই ধুলো—প্রাণটা একেবারে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কারু সঙ্গে কোন কথা নাই, সকলেই এক মনে জপ করিয়া চলিতেছি। মাঠে গরু চরিতেছে; দেখা গেল গরুর বর্ণ সব সাদা, অন্য বর্ণ বড় নাই। পূর্ব্বস্মৃতি, সঞ্চিতভাব, সুষুপ্ত চিন্তাসমূহ একেবারে প্লাবনের মত আসিয়া পড়িল। সকলেরই মুখমণ্ডল স্থির, ধীর, গম্ভীরভাবে ও আনন্দে পরিপূর্ণ; পূর্ব্ব জগৎ ছাড়িয়া যেন এক নূতন জগতে আসিয়াছি।

নন্দগ্রাম

ক্রমে গ্রামে পৌঁছিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট লালাবাবুদের কাছারী-বাটীতে উঠিলাম। সব সুবন্দোবস্ত ছিল, কাজেই আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া এবং মুখ হাত-পা ধুইয়া সকলের ইচ্ছা হইল যে, আগে মন্দির দর্শন করিয়া আসা যাক, তারপর আহারাদি করা যাইবে। কাছারিবাড়ীর লোকেরা আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল এবং আমরা মন্দির দর্শনে চলিলাম; বেলা তখন অপরাহ্ণ।

কাছারিবাটী হইতে খানিকদূর গিয়া একটি পাহাড় বা ঢিপীর পাদদেশে পৌঁছিলাম। এই পাহাড়ে উঠিবার পাথরের সিঁড়ি আছে। পাহাড়ে সহজে উঠিবার জন্য কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের কোন পূর্ব্ব পুরুষ নিজব্যয়ে ঐ পইঠাগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

তাঁহার নাম পাথরের উপর খোদাই আছে। এই হইল নন্দগ্রাম। আমরা গ্রামকে অতি শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলাম। কারণ, গ্রামটি হইল তীর্থ। তারপর সিঁড়ি বা পইঠাকে এবং তার নির্ম্মাতাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া চলিলাম। ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে লাগিলাম। আমরা সংখ্যায় দশ-বারো জন ছিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যখন ঠিক গ্রামে পৌঁছিয়াছি, তখন সকলে একসঙ্গে জয়ধ্বনি করিলাম, 'জয় রাধারাণী কী জয়!' এই জয়ধ্বনি শুনিয়া গ্রামের যত দোকানদার, যত পুরুষ, যত বালক সব লাঠিসোঁটা নিয়া বাহির হইয়া আসিল। উঠিবার সিঁড়ির পথ রুখিয়া দাঁড়াইল, আমাদের আর গ্রামে ঢুকিতে দিবেনা। তারপর তাহারা হাঁটু গাড়িয়া লাঠিহাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে কুড়ি-পঁচিশ জন মাটিতে বসিয়া পড়িল। তাহারা আপত্তি তুলিল যে, আমরা এদের গ্রামের অপমান করিলাম কেন? এ নন্দমহারাজার গ্রাম; নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি করাই উচিত, কিন্তু অপর গ্রামের লোকের নামে জয়ধ্বনি করিলাম কেন? শ্রীরাধা কে ছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ উঁহাকে গ্রহণ করাতেই ত তাঁর এত মান্য। "আপনারা এ গ্রামে আসিয়া ঐ গ্রামের রাধারাণীর নামে জয় দেওয়াতে এ গ্রামের ঢের অপমান করা হইয়াছে। আপনারা বলুন—জয় নন্দদুলাল কী জয়!" আমরা দুষ্টামি করিয়া সকলে আবার 'জয় রাধারাণী কা জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি করিলাম। এই ত আপোষে ঝগড়া বেশ জমিয়া উঠিল। যতক্ষণ না আমরা নন্দদুলালের জয় দিই

ততক্ষণ তাহারা আমাদের গ্রামে ঢুকিতে দিবেনা, কারণ আমরা অপর গ্রামের লোক, অর্থাৎ শ্রীরাধার দেশের লোক হইয়া পড়িয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের দলকে আমরা অপমান করিয়াছি, যেহেতু তাঁর স্থানে আমরা শ্রীরাধার জয় দিয়া কৃষ্ণ হইতে রাধাকে বড় করিয়াছি। খানিকক্ষণ এইভাবে আপোষে ঝগড়া, তর্কবিতর্ক, হাসিতামাসা, কৌতুকরঙ্গ করা গেল। শেষটা আমাদের বলিতেই হইল 'জয় নন্দদুলাল কী জয়!' তখন গ্রামের মানরক্ষা হইল; অমনি তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল, যেন আমরা তাদের পরম আত্মীয় হইয়া গেলাম। সকলে অতি যত্ন করিয়া আমাদের মন্দিরে লইয়া চলিল। মন্দিরটি একেবারে পাহাড়ের মাথার উপর। চারিদিকে পাথরের প্রাচীর, বড় উঠান এবং দরজায় ঢুকিয়া বাঁ-দিকে মন্দির। মন্দিরের চারি দিকে পরিক্রমা করিবার পথ আছে। মন্দিরে—একটি গর্ভ-গৃহ বা ঠাকুর ঘর, একটি নাটমন্দির, পরে প্রশস্ত উঠান। আমরা মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করিয়া জপ করিতে লাগিলাম। এই করিতে করিতে আরতির সময় উপস্থিত হওয়ায় আরতি সুরু হইল। মন্দির-প্রকোষ্ঠে বিগ্রহ দেখিলাম,—রাজা নন্দ ও রাণী যশোদা দাঁড়াইয়া আছেন, প্রমাণ আকারের মূর্ত্তি; নিকটে বালক কৃষ্ণ, বলরাম এবং আরও দুইটি রাখাল বালকের মূর্ত্তি। এখানকার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের কোমর বাঁকা নহে, সোজা দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; বাংলাদেশের ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম কৃষ্ণের মত নয়। এ মন্দিরে শ্রীরাধিকার কোন স্থান নাই।

আরতি শেষ হইলে গ্রামের সকল বয়সের স্ত্রীলোকেরা হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে ভজন গাহিতে লাগিলেন। যথার্থই নাটমন্দির বা নর্ত্তনমন্দির কাহাকে বলে, বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল। ক্রমে তাঁহারা মন্দির-পরিক্রমা করিতে করিতে ভজন গাহিতে লাগিলেন। নিজেদের ইষ্ট-দেবতা, সখা স্বজাতি স্বশ্রেণীর লোক বলিয়া এক অভিনবভাবের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভয় বা সঙ্কোচমিশ্রিত ভক্তি নহে, নিজেদের শ্রেণীরই একজন দেবতা, বা ইষ্ট হইয়াছেন—এইরূপ হর্ষ ও চাপল্যমিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তারপর কালো কালো মেটে, চ্যাপ্‌টা এবং গায়ে বেশ কির্‌কিরে খাঁজকাটা আছে, এইরূপ ভাঁড়ে করিয়া যে যার ঘর হইতে দুধ আনিয়া দিয়া গেল। বিকালবেলা গোদোহন হইলে অগ্রভাগ দুধ খানিকটা করিয়া কৃষ্ণকে দিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রীলোকেরা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইয়া আসিয়া রাত্রে এই দুধ খাবেন।" আমাদের ভিতর একব্যক্তি বলিলেন, "কৃষ্ণ ত অনেক কাল বিদেহ হ'য়েছেন, তিনি গোচারণ হ'তে ফিরে কিভাবে দুধ খাবেন?" গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অতীব বিস্মিত হইয়া এই কথা শুনিলেন ও অতি সরলভাবে বলিলেন, "তোমরা একি কথা বলচ? কৃষ্ণ মরবেন কেন? তিনি যে চিরকাল বেঁচে আছেন! সকাল বেলা মাঠে গরু চরাতে যান, বিকালবেলা ফিরে আসেন; তোমরা অমন কথা বলচ কেন?" আমি পিছন হইতে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতেছিলাম।

যাত্রী-বক্তাকে আমি চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া প্রকাশ্যে বলিলাম, "এঁদের সরল বিশ্বাসে হাত দিও না, তর্ক-বিতর্ক করিও না, ওঁরা অতি সরলপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ওঁদের ভাব ভাঙ্গিও না।" তাঁহাদের এই সরল বিশ্বাস দেখিয়া আমার প্রাণে মহা আনন্দের উৎস জাগিয়া উঠিল। ইঁহারা কিরূপ সরলভাবে জগৎকে দেখিতেছেন, কোন আড়ম্বর নাই, কোন লৌকিকতা নাই! সরল প্রাণে আত্মীয়জ্ঞানে ভগবানকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন। নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ছাড়া আত্মীয় জ্ঞানে ভগবানকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে অন্যত্র দেখি নাই। এই ভাবটি আমার কাছে নূতন বোধ হইয়াছিল। রাত্রি একটু বেশী হইলে আমরা মন্দির ও পাহাড় হইতে নামিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতে আবার মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরের চারিদিকে পাথরের খুব উঁচু প্রাচীর; এই প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। মাঠ, গাছ এবং মাঝে মাঝে টিলা বা টিপি। এই সকল স্থানকে খদ্দিরবন ও তমালবন বলে। বাতাস অতীব স্নিগ্ধ, দৃশ্য অতি মনোরম! পালে পালে সাদা গরু আঁকিয়া বাঁকিয়া নানারূপ বক্রগতিতে চলিতেছে। যত দূরে যায় গরুগুলি তত ছোট দেখায়। ক্রমে ছোট ছোট ছাগলের মত, পরে চঞ্চল বিন্দুর ন্যায় এবং অবশেষে আর দেখা গেল না। বোধ হইল, যেন মহাকাল বা প্রলয় আসিয়া সকলকে গ্রাস করিল। দৃষ্টি আর চলিল না, বহুক্ষণ অনিমেষ

নয়নে চাহিয়া রহিলাম। কুয়াসা-ঘোর তিমিরের ন্যায় দেখিতে পাইলাম, কিন্তু ধেনুগণ আর দৃষ্টিগোচর হইল না। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে দেখিয়া মন্দিরে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। পুনরায় বিকাল ৩।৪ টার সময় আবার মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের প্রাচীরে দাঁড়াইয়া গোচারণ-মাঠের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, গাঢ় তিমিরের ভিতর হইতে অস্পষ্ট দোদুল্যমান শুভ্র বিন্দুসকল ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রাণে একটা উল্লাস ও উৎসাহ জাগিল। একদৃষ্টিতে সকলে চাহিয়া রহিলাম ; ক্রমে বোধ হইল চঞ্চলগতি ক্ষুদ্র জীব, এবং পরে স্পষ্ট ছোট ছোট ধেনুগুলি আসিতেছে বলিয়া দেখা গেল। গাছগুলিও ছোট বলিয়া দেখাইতেছিল এবং ছোট ছোট ধেনু ছোট ছোট গাছের তলা দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রামের দিকে আসিতে লাগিল। ক্রমে গাছও বড় দেখা যাইতে লাগিল এবং ধেনুও বড় দেখা যাইতে লাগিল। গাছের তলাকার ছায়ার ভিতর দিয়া ধেনুগুলি আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিল। এইটি অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমরা পাহাড়ের উপর মন্দিরে দাঁড়াইয়াছিলাম, এই জন্য দৃষ্টি বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এবং বোধ হইতেছিল যেন, "সূক্ষ্ম স্থূলপ্রসবিনী, স্থূল পুনঃ সূক্ষ্মেতে মিলায়।" মহাকাল বা প্রলয় সমস্তকে একবার গ্রাস করিল এবং পরে আবার সব উদ্গীরণ করিয়া দিল। এরপর দিবা অবসানপ্রায় হইয়া আসিলে সকলে গান গাহিতে সুরু করা গেল ঃ

"গোধন ফিরে, ধীরে ধীরে ধীরে,
গগনে ছাইল রেণু।
(হাম্বা হাম্বা হাম্বা রবে)
ডুবিল রবি, রক্তিম ছবি,
বাজিল মোহন বেণু ॥
আকুল বেণী, ধাইল রাণী,
ঘন শ্বাস বহে তাহে।
ননী ল'য়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে,
অনিমিখ পথ চাহে ॥
গোঠে গহনে, ফিরায়ে গোধনে,
শ্রমবারি শ্যামকায়ে।
অলকা তিলকা, মলিন রেখা,
শিখিপাখা দোলে বাঁয়ে ॥
ভ্রমর জিনি, নূপুরধ্বনি,
রুণু ঝুনু রুণু বাজে।
বনমালা দোলে, বলা সাথে চলে,
করে ধরি ব্রজরাজে ॥
রাণী কুতূহলে, নিল কোলে তুলে,
মা ব'লে ডাকিল কানু।
রাখাল মিলি, দিল করতালি,
নাদিল শত ধেনু ॥"

বর্ষাণার সন্ধান—

অপর দিকে চাহিয়া দেখা গেল, বিস্তীর্ণ মাঠের অপর প্রান্তে আর এক পাহাড় ও গ্রাম। সেই গ্রামের নাম বর্ষাণা—শ্রীরাধিকার জন্মস্থান। নন্দগ্রাম হইতে উহা সাত আট মাইল দূর হইবে। এই পাহাড় হইতে ঐ পাহাড়টি স্পষ্ট দেখা যায়। বর্ষাণা বৃষভানু রাজার গ্রাম, শ্রীরাধার দেশ। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে আরও একটি ছোট পাহাড় আছে, উহার নাম 'সঙ্কেত'। আমরা এই পাহাড় হইতে ঐ পাহাড়কে প্রণাম করিলাম এবং পরদিন যাইতে মনস্থ করিলাম। পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইলে দেখা গেল মৃদু হাওয়ায় মাঠের উপর আকাশে ধুলোর মেঘ উঠিয়াছে; মাঠে অগণিত ঘন বৃক্ষরাজি এবং বহুদূরে মাঠের শেষ প্রান্তে সূর্য্য লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া ক্রমে ডুবিয়া যাইতেছে। এই সকল দৃশ্য অতি সুন্দর ও মনোরম।

নন্দগ্রামে অনেক বৈষ্ণব-সাধু তপস্যা করিবার জন্য থাকেন। আমাদের সহিত কয়েকজনের সাক্ষাৎ আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা বৃন্দাবন অপেক্ষা নন্দগ্রামে সাধন-ভজন করিতে অধিকতর পছন্দ করেন। এই নন্দগ্রামে আমরাও দিনকতক থাকার পর বর্ষাণার দিকে চলিলাম। বর্ষাণা যাইবার একমাত্র যান—গরুর গাড়ী। আমরা গরুর গাড়ী করিয়া বর্ষাণায় চলিলাম। গরুর গাড়ীকে ঐ অঞ্চলে 'বয়েলী' বলে, অর্থাৎ বয়েল (ষাঁড়) যুক্ত গাড়ী। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে আসিলাম। কি সুরম্য দৃশ্য! প্রশস্ত মাঠ,

পালে পালে গরু চরিতেছে এবং মাঝে মাঝে কুঞ্জ। কুঞ্জ বলিতে বর্ত্তুলাকারে সন্নিবেশিত বৃক্ষশ্রেণীকে বুঝায়। মাঠে সবুজ ঘাস কিন্তু এই তরুকুঞ্জ মাঝে কোথাও ঘাস নাই, আর যেখানে বা আছে সেখানকার ঘাসের রং ফ্যাকাশে সবুজ—অনেকটা পিঙ্গলবর্ণ (Brown) বলা চলে, ঠিক সবুজ রং নহে। গাছে গাছে ময়ূর; প্রতি গাছে অসংখ্য ময়ূরপুচ্ছ ঝুলিতেছে, বোধ হইতে লাগিল যেন কদমগাছে কদমফুল ফুটিয়া আছে। এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখি নাই। ময়ূরগুলি গরুরগাড়ী ও মানুষ দেখিয়া কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিল না, বরং কাছে গেলে ল্যাজের ঝাপ্টা মারিতে আসিল। কুঞ্জের তলদেশের ঘাসের রং অন্যরূপ ধারণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই স্থানের লোকেরা বলিল যে, রাত্রে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিয়া নৃত্য করেন, এইজন্য ঘাসগুলি সবুজবর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহা তাঁহাদের পাদস্পর্শের নিদর্শন! সাধারণ লোকেরা এরূপ সরল বিশ্বাসের সহিত এবং এমন ভক্তিবিগলিত স্বরে বলিল যে, আমাদের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল।

মাঠে গরু চরিতেছে; মাঝে মাঝে কৌপীন-পরা, খালি গা, হাতে রূপার বালা, শ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট রাখাল বালকদল,—হাতে বড় বড় বাঁশের লাঠি নিয়া তাহারা গরুর দল চরায়। কখনও কখনও তাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া নিজেরা খেলা করিয়া থাকে। গরুগুলি কখনও বা হেথা সেথা করিয়া বেড়াইতেছে। বিস্তীর্ণ মাঠে এই গোচারণ দৃশ্য অতি সুন্দর! প্রাতঃকাল, বেশ

ফুরফুরে হাওয়া বহিতেছে। এই মাঠ, এই কুঞ্জ, এই গরুর পাল, এই রাখাল বালকদল—এই সব দেখিয়া স্বভাবতঃই আশৈশব সঞ্চিত ভক্তির ভাব একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বস্মৃতি মানুষকে একেবারে আলোড়িত করিয়া দেয়, তাই মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের সব কঠোর ভাব ও বিচার-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সঙ্কেত ও জাবটগ্রাম

আমরা এইরূপে ধীরে ধীরে সঙ্কেতগ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে একটি মন্দির—মন্দিরে যুগলমূর্ত্তি দেখিলাম। গ্রামটি সামান্য ধরণের, আমরা নামিয়া প্রণামাদি করিলাম। সঙ্কেতগ্রাম সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এই যে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এই স্থানে সঙ্কেত করিয়া মিলিত হইতেন। যাহা হউক, এই গ্রামটি নন্দগ্রাম ও বর্ষাণার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

জাবটগ্রাম নন্দ-গ্রামের অপরদিকে। জনপ্রবাদ আছে, এই জাবটগ্রামে শ্রীরাধা জন্মিয়াছিলেন। এই সব কথা শুনিয়া, সুরম্য দৃশ্যাদি দেখিয়া বহুপূর্ব্বশ্রুত ঘটনাদি স্মরণ করিয়া সকলেই যেন একপ্রকার ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ক্রমে সঙ্কেত-গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় ৯টা হইয়াছে। দলের ভিতর কানাই-এর গলা বেশ মিষ্ট, সে গান গাহিতে পারিত। তাহার সঙ্গে সকলে গান ধরিলাম ঃ—

"রাধা বই আর নাহিক আমার—
রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।
মানের দায় সেজে যোগী,
মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে,—
তারে বড় ভালবাসি ॥"

সকলে একমনে একপ্রাণে সেই কুঞ্জের কাছ দিয়া যাইতে যাইতে এই গান গাহিতে লাগিলাম। তখন সম্মুখের কুঞ্জবন দর্শনে কী আবেগপূর্ণভাবে এই গানের উৎস প্রাণের ভিতর হইতে উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। গাড়ী অতি মন্থরগতিতে নানা কুঞ্জবন ও তরুগুল্মের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিল। মাঠে গরু চরিতেছে, সঙ্গে সেই হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ রাখালবালক। ময়ূরদল গাছ হইতে নামিয়া মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছে; গাভীগুলি কোথাও বা গাছের তলায় শুইয়া আছে, কোথাও বা দাঁড়াইয়া আছে। এই দৃশ্য দর্শনে মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উৎস উঠিল। সে আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, কেবল ভাবিবার বস্তু। ক্রমে এই মাঠ অতিক্রম করিয়া বর্ষাণাগ্রামে আসিয়া পোঁছিলাম।

বর্ষাণাগ্রাম

প্রথা হইতেছে, কোন তীর্থস্থানে গেলে আগে মন্দির ও

গ্রামকে প্রণাম-অভিনন্দন করিতে হয়। বিগ্রহ যেমন উপাস্য, মন্দিরও সেইরূপ উপাস্য এবং গ্রামও সেইরূপ প্রণম্য, কারণ ইহা তীর্থক্ষেত্র।

আমরা গাড়ী হইতে নামিলে নবাগত দেখিয়া গ্রামের অনেক লোক, বিশেষ করিয়া পাণ্ডারা যাত্রী পাইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইল। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক হইবে। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া প্রথমে বিগ্রহ, মন্দির ও গ্রামের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। কারণ, তীর্থভূমিতে পা দিবার পূর্ব্বে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। জুতা ও জিনিষপত্র গাড়ীতে রহিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পাণ্ডাদের রাগাইবার জন্য 'জয় নন্দতুলাল কী জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি করিলাম। নন্দ-গ্রামে বলিয়াছিলাম, 'জয় রাধারাণী কি জয়' আর এস্থলে বিপরীত ভাবের কথা বলিলাম। এই ত পাণ্ডারা ও গ্রামের লোকেরা রাগিয়া গিয়া আমাদের সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল যে, আমরা নন্দগ্রামের লোক অর্থাৎ কৃষ্ণের তরফের লোক, এই জন্য রাধিকার গ্রামে প্রবেশের অধিকার নাই। এইরূপে কিছুক্ষণ আপোষে ঝগড়া চলিল। তাহারা কিছুতেই আমাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবেনা বলিয়া আটকাইয়া রাখিল। অবশেষে মীমাংসা হইল এবং বলিতে হইল, 'বর্ষাণাকো দামাদ্‌কী জয়!', অর্থাৎ বর্ষাণার জামাতার জয়। কিন্তু নন্দ-তুলালের জয় বলিতে দিবে না। এইরূপে খানিকক্ষণ ঝগড়া, হাসি-তামাসা, আমোদ করিয়া শেষটা আমরা বলিলাম, 'জয়

রাধারাণী কী জয়!' তখনই সমস্ত ঝগড়া মিটিয়া গেল। তাহাদের গ্রামের জয়গান করা হইলে তখনই সকলে আমাদের আত্মীয় ও নিজগোষ্ঠী হইয়া গেল। এইরূপ আমোদের ঝগড়া কখনো কখনো বড় মিষ্টি লাগে। তাহার পর আমাদের থাকিবার জন্য তাহারা নানা বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু লালাবাবুর কাছারিবাড়ীতে পূর্ব্ব হইতেই থাকিবার বন্দোবস্ত ছিল, সেইজন্য সেইখানে উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পাণ্ডাদের দুইটি ছেলেকে (সহোদর) রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। বুড়োবাবা এই সকল কাজে পটু, তিনিই সমস্ত ভার লইলেন। পাণ্ডাদের ছেলে দুইটি হাঁড়ি, কাঠ, চাল এবং ডাল আনিয়া রাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল; আমরা সকলে 'ভানপুকুরা'য় স্নান করিতে গেলাম।

লালাবাবুদের কাছারিবাটী হইতে গ্রামটি সমস্ত অতিক্রম করিয়া ছোট একটি বালির মাঠ বা জায়গা পাওয়া যায়। তারপর একটি শিবের মন্দির এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিয়া 'ভানপুকুরা'য় পৌঁছিলাম।

'ভানপুকুরা'র প্রবাদ হইতেছে,—বৃষভানুর পুষ্করিণী; সেই-জন্য ইহার 'পুকুরা' বা 'ভানপুকুরা' নাম হইয়াছে। পুকুর বেশ দীর্ঘ, চারিদিকে 'গজগিরি' অর্থাৎ সিঁড়ি দিয়া বাঁধান। ঘাটেতে কয়েক স্থানে বেশ বড় অশ্বত্থ গাছ আছে এবং তলায় বেশ ছাওয়া। এই সব দেশের নিয়ম যে, কুলকুচা করিয়া মুখের উচ্ছিষ্ট জল পুকুরে বা নদীতে ফেলিতে নাই; এই কাজকে

ইহারা পাপজনক মনে করে। নদী বা পুষ্করিণীতে প্রস্রাব করিতে নাই; এই সকল স্থানে ইহা অতি দোষণীয় ব্যাপার। এইজন্য আমরা দাঁত মাজিয়া কুলকুচার জল হাতে করিয়া উপরে ফেলিলাম। নূতন বাঙ্গালীরা কুলকুচার জল নদীতে ফেলে বলিয়া স্থানীয় লোকের সহিত অনেক বিতণ্ডা হয়। এই ঘাটে স্নান করিতে করিতে দেখিলাম গ্রামের দিক হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি চাঁদনিওয়ালা ঘাট রহিয়াছে, অর্থাৎ ছাতওয়ালা ঘাট। আমরা স্নানান্তে সেই ঘাটের দিকে চলিলাম। ইহাকে 'রাণীর ঘাট' বলে। উপরে ছাত, জলের নীচের মাটি হইতে পিলপে তুলিয়া ঐ ছাতের থাম হইয়াছে এবং দুইটি থামের মধ্যের ফোকরটি ইঁটের জাফরী বা ঘুলঘুলি করিয়া প্রাচীর করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা ভিতরে স্নান করিবার সময় বাহিরের সমস্ত জিনিষ দেখিতে পাইবে, কিন্তু বাহির হইতে কেহ দেখিতে পাইবে না। বাহিরের জল রৌদ্র পাইয়া গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু রাণীর ঘাটের জল উপরে ছাত থাকায় গরম হইতে পারে নাই,—জল বরফের মত ঠাণ্ডা। স্ত্রীলোক কেহ উপস্থিত ছিল না, সেইজন্য আমরা কয়জন সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলাম। তাহার পর ভিজা কাপড়ে সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিলাম। দেখিলাম যে, ছাদের উপর হাওয়া খাইবার জন্য বৈঠকখানা ঘর ছিল, কিন্তু তাহা অনেককাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—কেবলমাত্র ছাদের মাঝে মাঝে দেওয়ালের ভাঙ্গা অংশ দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চিমে এইরূপ 'হাওয়াখানা' ও 'রাণীর ঘাট' অনেক-

স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর নামিয়া আমরা পুনরায় অশ্বত্থ গাছের তলার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিলাম। তাহার পর 'ভানপুকুরা'কে পরিক্রমা ও প্রণাম করিলাম। ক্রমে সকলে বাসার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পথে শিবের মন্দির পড়ায় কয়েক অঞ্জলি জল শিবের মাথায় দিয়া শিবপূজা করিয়া সকলে কাছারিবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

বেলা তখন প্রায় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। পাণ্ডার ছেলে দুটি খুব ভাল; তাহারা আমাদের জন্য ডাল ভাত ও একটা তরকারি রান্না করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া ভোজনাদি সারিলাম এবং নিজ নিজ খাটিয়ার উপর শয়ন করিলাম। এই হইল আমাদের সকাল হইতে মধ্যাহ্ন বেলার কার্য্য।

বেলা ৩টা বাজিলে পুনরায় আমরা সকলে মিলিয়া মন্দির দর্শন করিতে চলিলাম। গ্রাম খানিকটা পাহাড়ের উপর এবং খানিকটা পাহাড়ের গায়ে। আমরা পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া উপরে মন্দির দর্শন করিতে চলিলাম। উঠিবার পথে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে দুই চারিটি মন্দির আছে কিন্তু তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নহে; এইজন্য পাহাড়ের উপরের মন্দিরটি দর্শন করিতে মনস্থ করিলাম। পাহাড়টি বেশ উঁচু, নিতান্ত ছোট পাহাড় নয়। পাহাড়ের উপর হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। সেখান হইতে নন্দগ্রাম এবং মাঝে মাঝে দূরে দূরে পাহাড়ের টিপি বা টিলাও দেখিতে পাওয়া যায়। বেশ সুরম্য দৃশ্য। যাহা

হউক, আমরা শ্রীরাধিকার মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি পুরাতন এবং এককালে একটি বিশিষ্ট মন্দির ছিল বলিয়া বোধ হইল।

বিগ্রহ পূর্ব্বমুখী, কিন্তু কৃষ্ণের মূর্ত্তি নাই। আমরা মন্দিরে পূজা ও প্রণাম করিয়া খানিকক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার নিয়ম হইতেছে—বিগ্রহের দিকে মুখ রাখিয়া পিছন হাঁটিয়া আসা, বিগ্রহকে দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ দেখাইতে নাই। বিগ্রহের ঘরে বসিতে হইলে ডান বা বাঁ-ধারে বসিতে হয়। সম্মুখের স্থানটি ফাঁক রাখিতে হয় যাহাতে যাত্রী আসিয়া অনায়াসে দর্শন করিতে পারে, অর্থাৎ রাজসভার যে সকল আচার পদ্ধতি আছে মন্দিরে সেই সকল আচার পদ্ধতি মানিতে হয়। এই সকল প্রথা পালন না করাকে স্থানীয় লোকেরা বিশেষ দোষণীয় বলিয়া মনে করে। আমরা বিগ্রহের দিকে মুখ করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎ হাঁটিয়া দরজার নিকট আসিয়া বাহিরে আসিলাম এবং বিগ্রহের ডানহাত ডানদিক নির্দ্ধারণ করিয়া মন্দিরটি পরিক্রমা করিলাম। এই সকল গ্রামে মন্দির বা গ্রাম পরিক্রমা করা এক বিশেষ কার্য্য, কিন্তু বাঙলাদেশে এ সকল প্রথা তত দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীরাধিকার মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম, পাহাড়ের উপর পাথর কাটিয়া একটি পুকুর নির্ম্মাণ করা হইতেছে, অর্থাৎ বড় একটা চৌবাচ্চার মত তৈয়ারী করা হইতেছে। পাহাড়ের উপর যাহাদের বসতি তাহারা বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন করিয়া

আমাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিল। পাহাড়ের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া আমরা জয়পুরের নবনির্ম্মিত মন্দিরটি দেখিতে গেলাম! এই মন্দিরগাত্রে ব্রজ-লীলার নানা চিত্র রহিয়াছে।

গেবার বন

এই মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাহাড় নামিয়া বা উতরাইয়া যাইতেছে। ইহাকে গেবার বন বলে। এই স্থানটি অতি সুরম্য। বুড়োবাবা থাকিবার খাইবার সমস্ত ভার লইয়াছিলেন এবং কানাই মন্দির দর্শন করানো ইত্যাদির ভার লইয়াছিল। কানাইএর আসল নাম হইল, বলাই রায়—বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তখনও গলায় পইতা ছিল। এখন তাহার সন্ন্যাসী-নাম, অনন্তানন্দ। কসি স্টেশন হইতে যখন হরিণ ও ময়ূর দেখিতে দেখিতে নন্দগ্রামের দিকে চলিলাম, তখন হইতে কানাইএর ভাবান্তর হইল। যদিও সে অতি ধীর, নম্র ও সেবাপরায়ণ কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার ভিতর ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সে যেন ভাবে, ভক্তিতে ও আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া পড়িল। বর্ষাণার মাঠে আসিয়া তাহার ভাব উত্তাল হইয়া উঠিল। এবং যখন বর্ষাণার পাহাড়ের উপর মন্দির দর্শন করিতেছিলাম, তখন কানাই ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া পড়িল। পাছে বাড়াবাড়ি করে বা অধীর হইয়া পড়ে এইজন্য আমি গম্ভীরভাব ধারণ করিলাম। তাহাকে অনেক পরিমাণে

সংযত করিলাম এবং দেখিলাম যে, কানাইএর ভিতরে সম্পূর্ণ অন্যভাব আসিয়াছে। কানাইএর চিত্ত অতিকোমল ও সে অতি মিষ্টভাষী, বিনয়ী এবং সেবানিরত। এইজন্য সকলে তাহাকে আদর করিয়া বলিত 'জয় কানাইয়ালালাজী লাড্ডু-পেড়া-বরফিকী'। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পথটা বিশেষ জানা নাই, গ্রামের রাস্তা ধরিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিব বা গেবার বন দিয়া উতরাই পথে গ্রাম পরিক্রমা করিতে করিতে বাসস্থানে ফিরিব, এই হইল সমস্যা। সঙ্গে পুরীর লোকেরা, পাণ্ডাদের দুইটি ছেলে ও আমরা অনেকগুলি। সকলে যখন ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় কানাই জোর করিয়া গেবার বনের দিকে চলিতে সুরু করিল, কাজেই আমরাও পিছু পিছু যাইতে বাধ্য হইলাম।

এই গেবার বন অতি রমণীয় স্থান। অনেক সাধু ছোট ছোট কুটীর বা আশ্রম করিয়া এই স্থানে বাস করেন। স্থানটি অতি পবিত্র ও রমণীয়।

উপর হইতে নামিবার সময় দেখিলাম যে, পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামিয়াছে। এই পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হইল। নীচু হইতে কয়েক ব্যক্তি উপরে উঠিতেছিল, তাহাদের আমি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, পূর্ব্বে পাহাড়ে উঠিবার পথ অতি দুর্গম ছিল; সিঁড়ি বা ধাপ কিছুই ছিলনা। এক সাধুর ব্রত বা সঙ্কল্প হইল যে, অপরের সাহায্য বা অর্থগ্রহণ

না করিয়া তিনি নিজে কায়িক পরিশ্রমে নীচে হইতে উপরে উঠিবার সুগম সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দিবেন। এই ব্রত অনুযায়ী কিছুকাল পরিশ্রম করিয়া তিনি এই আয়াসসাধ্য সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন! আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া সকলকে বলিলাম, "দেখ, এই সিঁড়ির এক একটি ধাপ সেই মহাত্মার তপস্যার পর্য্যায় ও পরিমাণ।" সিঁড়িতে পা দিবার পূর্ব্বে সকলকে বলিয়া দিলাম যে, সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া সকলে যেন সিঁড়িতে পা দেয়। ইহা সিঁড়ি নয়, পবিত্র মন্দির। তদনুযায়ী আমরা সকলে জোড়হাত করিয়া সেই অজ্ঞাত পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া একে একে সিঁড়িতে পা দিতে লাগিলাম। কানাই তখন বিভোর, তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বরে সে গান ধরিল। আমরাও যোগ দিলাম ঃ—

"কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মায়ী।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী,
কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহাসে পাই॥
কাঁহা মেরি যমুনাতট,
কাঁহা মেরি বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই॥"

পুনরায় সকলে গান ধরিলাম ঃ—

"দে গো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী, ফিরি কেঁদে কেঁদে ॥
ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি,
ওগো তাইত আসি, দেখ্ মা উপবাসী
দেখ্ মা দ্বারে যোগী, বলে—'রাধে রাধে' ॥
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনা-তীরে,
আঁখিনীর মিশে নীরে,—
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে ॥"

কখনও বা সকলে গাহিতে লাগিলাম ঃ—

* * * *

কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে,
রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে,—
তারে বড় ভালবাসি ॥"

এদিকে অন্ধকার হইয়া আসিল, দুই পাহাড়ের মাঝে ফাটল বা গলি এবং চারিদিকে জঙ্গল। অনেকেই এক সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছি, কীর্ত্তনটা বেশ জমিয়া গেল। আশে পাশে সাধুদের আশ্রম, অভ্যর্থনা করিয়া অতি প্রীতিসহকারে তাঁহারা আমাদের লইয়া যাইতে লাগিলেন। একটি আশ্রম—মালতী গাছের কুঞ্জ, স্থানটি অতি সুরম্য। সব আশ্রম হইতেই রাত্রিতে থাকিবার

ও আহারাদি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু অত লোক লইয়া আশ্রমে থাকা উচিত নয়, এই বিবেচনা করিয়া জোড়হাতে সাধুদের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "ম্যায় কর্‌জোড়ি মহারাজ! ম্যায় কর্‌জোড়ি!" তবে সব বিষয়েই প্রত্যাখ্যান করা অবজ্ঞাসূচক—এই বিবেচনা করিয়া কোন আশ্রমে এক ঢোক জল খাইলাম, কোথাও বা কলিকা'টা হাতে লইয়া একটান তামাক খাইলাম। প্রত্যেক স্থলেই কোন-না-কোন বস্তু গ্রহণ করা হইল। উপর হইতে নীচে নামিয়া যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম যে, ডানদিকে ছোট ছোট ধাপ দিয়া উপরে একটি সিঁড়ি গিয়াছে—সেটিও দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম—উপরে একটি মন্দির, মন্দিরে বিগ্রহ ও দুইজন পূজারী। একজন পূজা করিতেছে ও অপরে করতালি বাজাইতেছে। আমাদের একটি দল উপস্থিত দেখিয়া দ্বিতীয় পুরোহিত আমাদের সম্মুখে একটি ঝোড়া আনিয়া দিল। তাহাতে ঘড়ি, কাঁসর, করতাল ইত্যাদি অনেক বাদ্যযন্ত্র ছিল। সকলেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী এক একটি বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাজাইতে লাগিলাম। এদেশের প্রথা হইতেছে—আরতির সময় যাত্রীদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা নিয়ম-বিরুদ্ধ; বাতাস করিয়া অথবা করতাল বাজাইয়া যেরূপেই হউক বিগ্রহ-দর্শন ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

আর একটা কথা—বাঙ্গলাদেশে ঘড়ি বাজাইবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই। কিন্তু এ দেশের নিয়ম হইল, বাঁদিকে

একটা কাঠের মুগুর দিয়া টোকা মারা, তারপর ডানদিকে একটা, তারপর নীচের দিকে একটা টোকা মারা,—আওয়াজ হইবে, 'রা—ধে—শ্যাম'।

মন্দিরে, পূজারীদ্বয় থাকিতে ও আহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমরা মিনতি করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। অন্ধকার হেতু একজনের কাছে একটা লণ্ঠন চাহিয়া লইয়া লালাবাবুর কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম।

সেবার বনের অপরদিকে আর একটি পাহাড় আছে। তথায় অনেক সাধু তপস্যা করিয়া থাকেন। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বর্ষাণাতে কিছু দিন তপস্যা করিয়াছিলেন, তবে কোন্ স্থানটি ঠিক জানা নাই। হরি মহারাজ একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি সম্মুখের পাহাড়ে 'গঙ্গামাঈ'কে দেখিতে যান। গঙ্গামাঈর বয়স তখন ছিয়াশি বৎসরের উপর। দুইটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার সেবাযত্ন করিতে নিযুক্তা। হরিমহারাজ গঙ্গামাঈকে ঠাকুরের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) কথা বলিতেই তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "তু মেরা লালাকো।" হরিমহারাজকে অভয় দিয়া বলিলেন, "যখন তুমি আমার লালার আশ্রয় পেয়েছ, তখন তোমার কোন ভয় নেই। তুমি উঁচু দিকে চ'লে যাবে।" এই সব বলিয়া হরি মহারাজকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

বনের পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী ফিরিতে আমাদের প্রায় রাত্রি ১০টা বাজিল। সকলেই ক্লান্ত, কাহারও আর খাইতে

ইচ্ছা নাই। পরিশ্রমের দরুণ সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, "এখন চা খাব ও রাতে সামান্য কিছু খাব।" পাণ্ডাদের ছেলে দুইটি আমাকে একটু চা করিয়া দিল এবং তামাক সাজিয়া দিল। আমি একটু সুস্থ হইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের বাড়ীতে মেয়েছেলে গিন্নীবান্নী কেউ আছেন কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ"। আমি বলিলাম, "তাহ'লে দোকান থেকে আটা, ডাল এবং আর যা যা আবশ্যক হয় নিয়ে যাও, আর বাড়ী হ'তে খাবার তৈরী ক'রে নিয়ে এসগে।" সঙ্গের পুরীর লোকেরা একটা টাকা বাহির করিয়া দিল। ইতিমধ্যে দোকানদারেরা আগলবন্ধ করিয়াছিল। তাহাদের অনেক অনুনয় বিনয় করায় আগল খুলিয়া ডাল, আটা, ঘি ও আলু দিল এবং ছেলে দুটি সমস্ত জিনিষ তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল।

বিখ্যাত কড়ায়ের ডাল

এদেশে ডাল রাঁধিবার প্রথা অন্যপ্রকার। এদেশে এক ঝোড়া গোবরে একখানা ঘুঁটে হয়। এই রকম একখানা ঘুঁটে চারিভাগ করিয়া ভাঙ্গিয়া মাঝে মাঝে একটু আগুন দিয়া তার উপর বাঁটলোটি বসাইয়া দেয়। তার মধ্যে পরিষ্কার ক'রে ধোয়া ভূষিওয়ালা কড়ায়ের ডাল, পরিমিত মাপে জল, করকচ লবণ, আস্ত লঙ্কা ও হলুদ দিয়া বাঁটলোর (ওদেশের ঘটি) মুখটি একটি বাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেয় ও সেই বাটিতে জল দিয়া রাখে। ডাল মিঠে আঁচে গুমিয়া গুমিয়া সুসিদ্ধ হইয়া

দেখিতে অনেকটা তালপাটালির মত হয়। তাতে হিঙের ফোড়ন ছিল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। ঘি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আলুছেঁচ্‌কি—ঘি, পাঁচ্‌ফোড়ন ও হিং দিয়া হইয়াছিল। মোটা মোটা গরম গরম রুটিগুলি তুলতুলে নরম হইয়াছিল; তাহার সঙ্গে একটু আমের আচার দিয়াছিল। ঐরূপ সুন্দর কড়ায়ের ডাল আর জীবনে খাই নাই। উহা ইঁদারার জলের গুণ কি ঘুঁটের মিঠে আঁচের গুণ বা রাঁধিবার গুণ তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু বর্ষাণার এই কড়ায়ের ডাল রান্না অতি বিখ্যাত। যাঁহারা ঐ অঞ্চলে গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিবেন।

আমরা সকলে রুটি, ডাল, আলুচচ্চড়ি খাইতে লাগিলাম। কানাই খাইল না। তাহার জন্য দুখানা রুটি ও এনামেলের চায়ের একটা বড় বাটি ক'রে খানিকটা ডাল তুলিয়া রাখা হইল। সেদিনকার ডালটা এত ভাল হইয়াছিল যে, অনেকেই বাঁটলোর ভিতরটা আঙ্গুল দিয়া চাঁচিয়া চাঁচিয়া সেই আঙ্গুল চাটিতে লাগিল। আমারও খাইবার পরিমাণটা একটু বেশী হইয়াছিল। রাত্রে আহারের পর শুইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া মুখ হাত-পা ধুইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দুখানা গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত হইল। মাল-পত্র গাড়ীতে রাখিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে এমন সময় কানাই বলিল যে, সে একা যাইবে, কাহারও সহিত একত্রে যাইবে না। কানাইকে দেখিলাম, সে যেন একটু বিভোর ও তন্ময়ভাবে

রহিয়াছে এবং সেই জন্য সে নিরিবিলি যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। সে এক হাতে দুখানা রুটি গুটাইয়া লইয়াছে এবং অপর হাতে ডালের বাটির আংটাটা ধরিয়াছে—এইভাবে সে চলিতে লাগিল। কানাই যখন গাড়ীতে চড়িল না, আমরা তখন গাড়ী চড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম। জুতা ও জিনিষ-পত্র গাড়ীতে রাখিয়া গাড়োয়ানকে বলিয়া দেওয়া হইল, গাড়ী দুখানা লইয়া তাহারা যেন স্টেশনে যায়, আমরা পিছনে যাইতেছি। গাড়োয়ান দুটি গ্রামের ব্রাহ্মণ ছিল। একজন আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল ঃ—

"ব্রজকা মেবা টেটী,
বাজরেকী রোটী,
বড়ে গোয়ালেকী বেটী।"

অর্থাৎ, বালির মাঠে নিমফলের মত একপ্রকার ফল হয়, তাহাকে বলে 'টেটী'। 'বাজরেকী রোটী' হইল, ছোলার আটা অধিক পরিমাণে (বেসম নয়) মক্কার আটা ও 'বাজর' আটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আর গমের ও যবের আটা ; এই পাঁচমিশিলি আটার সহিত নুনলঙ্কার গুঁড়া মাখাইয়া আধসের আটায় তিন খানা রুটি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া লয়। ইহাই হইল 'বাজর' বা মিশ্রন আটার রুটি। ইহা বাঙ্গালীর পেটে হজম হইবার নহে। আর 'বড়ে গোয়োলেকী বেটী' হইলেন—শ্রীরাধিকা। এই সকল কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণটি ঠাট্টা করিয়া তাহাদের দেশের কথা আমায় বুঝাইতে লাগিল। এইরূপে আমরা গ্রাম ত্যাগ

করিয়া প্রশস্ত মাঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন ফরসা হইয়াছে, একটু একটু রৌদ্র উঠিয়াছে। কানাই একহাতে পাকানো রুটি ও অপর হাতে ডালের বাটি লইয়া তন্ময়ভাবে মাঠের একদিক ধরিয়া চলিতে লাগিল। কখনও বা মাঠের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইতেছে—নিশ্চল নির্ব্বাক্। মাঝে মাঝে বিভোর হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত তরুকুঞ্জের ভিতর যাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে, বৃক্ষের উপরিস্থিত ময়ূর সকল কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া বড় বড় লেজ তাহার গায়ে বুলাইয়া দিতেছে। সেই সময় আমরা সকলে গান ধরিলাম ঃ—

"এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক-শারী, মুখোমুখি করি,
হের নৃত্য করে, ময়ূরময়ূরী ॥
মত্ত-ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জ-বন সুখে ভেসে যায় ;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে ওঠলো কিশোরী ॥"

অতি প্রত্যূষে অনেকে একসঙ্গে গান করাতে শব্দ অতি শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। কানাই আবার বিভোর অবস্থায় এক দৌড় দিয়া মাঠের মাঝে যে ব্রহ্মকুণ্ড ছিল, সেই দিকে চলিল। আমরাও মাঠের যেখান সেখান দিয়া কানাইএর পিছন পিছন চলিতে লাগিলাম। গাড়ী দুখানা দূরে মাঠের রাস্তা দিয়া স্টেশনের দিকে চলিল। এই সময় ফরসা হওয়ায় রাখালেরা

গরু লইয়া মাঠে আসিল। এদিকে সূর্য্যের রশ্মি মৃদুভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মাঠ, রাখালবালক ও গরু, গাছে ময়ূরদল—এই দৃশ্য দেখিলে স্বভাবতঃই মনে একপ্রকার ভাব আসে।

বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলার এইটি প্রধান স্থান। এইজন্য কানাই ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিল এবং কম বেশী সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গোষ্ঠ-সঙ্গীত বা Pastoral song সকল দেশেই অতি মধুর এবং এই নন্দগ্রাম বর্ষাণাতে অতীব প্রীতিপ্রদ ও মনোমুগ্ধকর। Pastoral song বা গোষ্ঠ-সঙ্গীত গ্রাম্য লোকের পক্ষে অতি প্রীতিকর। কারণ ইহাতে গ্রামের বিশেষ বর্ণনা থাকে। এই গোষ্ঠ বা মিলন-সঙ্গীত এই মাঠেই অতি মধুর ও প্রাণস্পর্শী হয়!

কানাই ভাবাবেশে এইরূপ দৌড়াদৌড়ি করায় অনেক বেলাতে নন্দগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইবার সঙ্কেত গ্রামের পথ নহে; কেবল মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলাম। তারপর নন্দগ্রাম হইতে আমরা কসির দিকে চলিলাম। তখন বেলা প্রায় ১টা হইয়াছে। কানাই ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইল এবং বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমরা কসি স্টেশনে যাইয়া বসিলাম। অতঃপর কসি স্টেশন হইতে ট্রেনে করিয়া মথুরায় আসিয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইলাম।

কানাইএর কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ অন্যমনস্ক ও ঘোর ঘোর ভাব ছিল এবং মনটা যেন অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছিল!

অনুরূপ ঘটনা আর একবার ঘটিয়াছিল। কয়েক বৎসর পর কাশীর চারু (শুভদানন্দ) ঐ নন্দগ্রাম ও বর্ষাণায় গিয়াছিল। চারু, হরিণ ও ময়ূর দেখিয়া একেবারে বিভোর ও তন্ময়। কোথায় বা তার জুতা, কোথায় বা তার বহির্বাস। কানাই সঙ্গে ছিল, সে চারুর জুতা ও বহির্বাস লইয়া পিছন পিছন ছুটিয়াও শেষ পর্য্যন্ত সন্ধান রাখিতে পারে নাই। চারু বিভোর হইয়া কখনও বা হাততালি দিয়া ময়ূরদের সহিত নাচিতেছে, কখনও বা হাততালি দিয়া হরিণদের পিছু পিছু দৌড়াইতেছে। বিভোর বে-এক্তার-ভাবে সারাদিন মাঠে মাঠে বেড়াইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় এক চাষী তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া ধরিয়া বাড়ীতে আনিয়াছিল, এবং দুধ রুটি খাওয়াইয়া রাত্রে সতর্কতার সহিত রাখিয়াছিল। পরদিন কানাই অনেক অনুসন্ধানের পর তার দেখা পায় এবং কসি হইতে মথুরা হইয়া বৃন্দাবনে ফিরাইয়া আনে। ফিরিয়া আসিলে আমি ইসারায় কানাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেঠো ভূতটা কার ঘাড়ে চেপেছিল ?" কানাই বলিল, "চারুদার ঘাড়ে চেপেছিল, তাকে অনেক কষ্টে ফিরিয়ে এনেছি।"

স্থান মাহাত্ম্য

এই সব ঘটনা হইতে স্থানমাহাত্ম্যটি স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল। এই পাহাড়, মাঠ, ঘাট, বন সবই একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান স্থান, অন্যদিকে তেমনই এই সকল স্থানে বহু সংখ্যক তপস্বী বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিতে করিতে দেহ-

বিসর্জ্জন করায় তাঁহাদের অমোঘ তপঃশক্তি অক্ষয় হইয়া তথায় বিদ্যমান। স্থূল দৃষ্টিতে এই সব স্থানে পাথর, ঘাস, ধূলা, লতা, বিটপীকুঞ্জ ইত্যাদি বিকাশমান হইলেও সংযত চিত্তে এবং শ্রদ্ধা-ভক্তিপ্লুত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তীর্থভূমি ও তপঃক্ষেত্ররূপে নিরীক্ষণ করিলে স্থান সমূহের অভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বতন তপস্বীদের মহতী তপঃশক্তি মৃদু অগ্নিশিখার ন্যায় অনুভূত হইবে। তাহা স্পষ্ট দেদীপ্যমান! যাঁহারা এইরূপ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ সরল প্রাণ লইয়া এই সব তীর্থক্ষেত্র দর্শনের প্রয়াস করিবেন তাঁহারা অতি অবশ্য তথাকার অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জ দ্বারা প্রভাবিত হইবেন। এই বিষয়টি আমি অনেক উচ্চ অবস্থার সাধুদের মুখে শুনিয়াছি এবং নিজেও প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি।

আমরা কোন্ অতীতে নন্দগ্রাম ও বর্ষাণা দর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সেই মধুর আনন্দের স্মৃতি অদ্যাপি মনে জাগরূক রহিয়াছে।

মথুরা দর্শন

বৃন্দাবনের কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থানকালে আমার ইচ্ছা হইল যে, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দর্শন করিতে যাইব। কালাবাবুর কুঞ্জ হইল বংশীবট যমুনাতটে। বাড়ীখানি ঠিক যমুনার উপর। পাড়ার নাম বংশীবট। বলরাম বাবুদের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য, কলিকাতা বাগবাজারের বলরাম বসু) পূর্ব্বপুরুষেরা এই কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। কুঞ্জের

বাহিরের উঠানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ছিল। এই কুঞ্জকে কালাবাবুর কুঞ্জ বলে। একদিন সকালবেলা বুড়োবাবা, আমি, কানাই ও আর একজনকে সঙ্গে লইয়া আমরা বৃন্দাবন হইতে মথুরা গেলাম এবং তথা হইতে যাতায়াতের একখানা গাড়ীভাড়া করিয়া গোবর্দ্ধন দর্শন করিতে চলিলাম। বৃন্দাবন হইতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রায় তেইশ মাইল হইবে।

মথুরা হইতে খানিকটা যাইয়া ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পৌঁছিলাম। বৃন্দাবনে যেমন গোপেশ্বর মহাদেব প্রসিদ্ধ, মথুরায় সেইরূপ ভূতেশ্বর মহাদেব। আমরা ভূতেশ্বর মহাদেবকে পূজা করিয়া গোবর্দ্ধনের পথে চলিলাম। পথে খানিকটা যাইয়া একটা প্রশস্ত মাঠে পড়িলাম। এই মাঠটি প্রশস্ত ও মাঝে মাঝে তমাল গাছের ঝোপ আছে, কিন্তু নিকটে লোকালয় না থাকায় এই জায়গায় বড় ডাকাতের ভয়। দিনের বেলায় বা রাত্রিতে অনেক সময় ডাকাতেরা মারপিট করিয়া জিনিষপত্র কাড়িয়া লয়। যাহা হউক, আমরা গাড়ী করিয়া গোবর্দ্ধনের দিকে চলিলাম। প্রশস্ত মাঠ এবং পালে পালে গরু চরিতেছে, রাস্তার দুইধারে সারবন্দী তমাল গাছ। এইজন্য স্থানটি দেখিতে বড় ভাল লাগে। কোন কোন জায়গায় বড় বড় ছাগলের পাল চরিতেছে। এখানকার বকরী বা ছাগল তিন সের হইতে পাঁচ সের পর্য্যন্ত দুধ দেয় কিন্তু অপর জায়গায় লইয়া গেলে এই ছাগল এইরূপ দুধ দেয়না। ইহা হইল এই স্থানের ঘাসের গুণ। মথুরার গাভীও এইরূপ

বিখ্যাত; এইজন্য মাথুর-গাভীর কথা অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

গোবর্দ্ধনের পথে—

রাস্তার দুইধারে যে সমস্ত দ্রষ্টব্য বিষয় আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা গোবর্দ্ধনের দিকে চলিলাম। মাঠ, গরু, তমাল গাছ এই সকল দেখিতে লাগিলাম এবং ভাগবত ও অপর গ্রন্থে গোবর্দ্ধনের যে সকল কথার উল্লেখ আছে তাহা চিন্তা করিলাম।

গোবর্দ্ধন পাহাড়ের যে দিকে রাস্তা গিয়াছে সে দিকটা যেন মাটির ভিতর খানিকটা বসিয়া গিয়াছে এবং ওদিককার অর্থাৎ দূরের অংশটা যেন উঁচু হইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটা সিংহ থ্যাব্‌ড়ানি খাইয়া বসিয়া সম্মুখের পা ও মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। নীচু মাঠ হইতে গাড়ীখানা ধীরে ধীরে একটু একটু চড়াই করিতে লাগিল এবং পাহাড়ের নিম্নস্থান দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনের উপর দিয়া গাড়ী চলিতেছে, এইজন্য আমরা গিরিরাজকে বিশেষ করিয়া প্রণাম করিলাম। গোবর্দ্ধনকে এস্থানে গিরিরাজ বলে। কচ্ছপের পিঠের খোলার মত উঁচু জায়গাটা পার হইয়া আবার আমরা সমতল ভূমিতে আসিলাম এবং গোবর্দ্ধন গ্রাম বা সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই গ্রামখানিকে একটি ছোট সহরও বলা যাইতে পারে। অনেক যাত্রীসমাগম হয় বলিয়া এখানে

অনেক খাবারের দোকান ও একটি ছোট বাজারও আছে। আমরা রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে স্নান করিব, এইজন্য গোবর্দ্ধনে আর বেশী বিলম্ব করিলাম না। গোবর্দ্ধন হইতে অল্পদূর যাইয়া কুসুম সরোবরে পৌঁছিলাম এবং এখানেও বিলম্ব না করিয়া প্রণামান্তে কয়েক মাইল দূরে রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডতে আসিলাম। মাঠে যে স্থানে জলের লহর আছে ও বড় একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, গাড়ীখানা সেইখানে রহিল, আমরা রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

বিবাহোৎসবে পূর্ণকুম্ভ সহ গ্রাম্য মহিলাদের গ্রাম পরিক্রমা

গ্রামের পথে চলিতে চলিতে অল্পদূর গিয়াছি এমন সময় শুনিলাম বাজনার শব্দ হইতেছে এবং ক্রমে দেখা গেল একদল স্ত্রীলোক বাজনার সহিত আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে একটা বা দুইটা জলের 'ভারী' বাঁকে করিয়া জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়াছে, কুম্ভের মুখে আমপাতা বা অন্যকোন পাতা দেওয়া। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অল্পদূর আসিয়া একটা গাছের ছাওয়াতে দাঁড়াইল এবং বাজনা-ওয়ালারা ছাওয়ায় মাটীতে বসিয়া তাহাদের বাঁশী বাজাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকদের দলের ভিতর একজন মুখের ওড়নাটা ঘোমটা করিয়া টানিয়া দিল, অর্থাৎ গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা হইল। তারপর সেই স্ত্রীলোকটি খানিকটা আগাইয়া আসিয়া বাজনার সহিত নাচিতে লাগিল। পরিচ্ছদ হইল ঘাগরা,

কাঁচুলি ও ওড়না। বাজনার সঙ্গে হাত দোলাইয়া, পায়ে তাল দিয়া এমন সুন্দর নাচিতে লাগিল যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। গৃহস্থ মহিলাদিগের নাচ এই প্রথম দেখা গেল। বাংলাদেশে আগে বিবাহের পূর্ব্বে জলসওয়া এক প্রথা ছিল। অর্থাৎ পুকুরে গিয়া জল আনা—ইহা শুধু সধবা স্ত্রীলোকেরা করিত। এখন সেই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। নৃত্যগীত ব্রজমণ্ডলের সকল মেয়েদেরই অল্পবিস্তর শিখিতে হয়। ইহা হইল স্থানীয় প্রাচীন প্রথা; আবার কোন কোন মেয়ে বাপের কাছে লাঠি-খেলাও শিখে। এদেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শরীর সুদৃঢ় ও সুস্থ। এদেশের মেয়েদের লাঠি খেলায় ও লাঠি চালনায় বেশ একটু অধিকার আছে। রাজপুত ও গয়লা মেয়েদের ভিতর লাঠি খেলার চলন আরও অধিক। ইহারা যখন লাঠি লইয়া দাঁড়ায় তখন অনেকেরই ভয়ের কারণ হয়।

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দর্শন

ক্রমে আমরা রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডতে আসিলাম। এখানে একটি ছোট গোবিন্দজীর মন্দির আছে। তথাকার কাম্‌দার বা কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ থাকায় আমরা এই কুঞ্জে থাকিবার মনস্থ করিলাম। মাথাপিছু এগার পয়সা দিলেই প্রসাদ পাওয়া যাইবে। আমরা থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডে চলিলাম। রাধাকুণ্ড হইল একটা বড় পুকুর, গজগিরি করা, অর্থাৎ চারিদিকেই ঘাট-বাঁধান এবং একদিকের

ঘাটে, পাথরের লম্বা লম্বা টালি দিয়া পুল করা হইয়াছে। জল নিম্নদিক দিয়া যাইয়া আর একটা পুকুরের সহিত মিশিয়াছে, সেইটি হইল শ্যামকুণ্ড। ইহার চারিদিকে বাঁধান নয়, গড়ান পাড় আছে এই মাত্র; অর্থাৎ একটা পুকুরের মাঝখানে বাঁধ দিয়া যেন দুইভাগ করা হইয়াছে। আমরা স্নান করিয়া ঘাটের একপাশে বসিয়া পূজা ও তর্পণাদি করিতে লাগিলাম, কারণ ইহা একটি তীর্থ বিশেষ। একজন পাণ্ডা আসিয়া তীর্থের নিয়মানুযায়ী মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। তারপর আমরা রাধাকুণ্ডকে পরিক্রমা করিয়া শ্যামকুণ্ডে গিয়া আবার স্নান করিলাম। এইরূপে নিয়মিত সমস্ত কার্য্যই করিলাম। সহরটি বেশ সুন্দর। প্রধান রাস্তা বড় বড় পাথরের টালি দিয়া বাঁধান। বাজার দোকানও আছে। গ্রামটি দেখিলে কিছুদিন বাস করিতে ইচ্ছা হয়! স্থানটি বেশ সুরম্য! ভাল হাওয়া, চারিদিকে তমাল গাছের ঝোপ বা কুঞ্জ—অদূরে গোবর্দ্ধন। এই সব দেখিতে পাওয়ায় এবং পাঁচ রকম ভাব স্মরণ হওয়ায় এ স্থানটায় যে একটা শক্তি আছে তাহা টের পাইতে লাগিলাম।

গোবিন্দজীর মন্দির একটি ছোট ঘর এবং খানিকটা নাট-মন্দির। এই নাট-মন্দিরের মাঝখানে একখানি পাথর আছে। পাথরটির ভিতর ফোয়ারার একটি নল আছে। একটি তামার পাত্র করিয়া ছাতের বরগার কাছে জল রাখা হয়। সেই পাত্র হইতে সরু একটা নল, দেওয়ালের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়া, মেঝের মাটির ভিতর দিয়া এই মাঝখানের চৌকো পাথরের

টালি দিয়া, ফোয়ারার মুখের সম্মুখে যোগ হয় এবং ফোয়ারার চাবির প্যাঁচ্‌টা একটু খুলিয়া দিলেই খুব তোড়ে ফোয়ারা ওঠে। কখনও বা এই জলের সহিত গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া দেওয়া হয়। মন্দিরে জলের ফোয়ারা বৃন্দাবন ছাড়া অপর স্থানে দেখি নাই, এইজন্য কথাটি এত মনে আছে।

মথুরার শিবমন্দির

শিবলিঙ্গের দুই পাশে দুইটি পিতলের সাপ ফণা ধরিয়া আছে। সাপ দুইটির মাথা কিছু দূরে করিয়া দেওয়া আছে এবং সাপের যে দুইটি দাঁত আছে সেই সরু নলের ভিতর দিয়া সরু ধারায় জল আসিয়া শিবের মাথায় পড়ে। এইরূপে দুইটি সাপের চারিটি দাঁত হইতে সরু ধারায় জল আসিয়া শিবের মাথায় একজায়গাতে পড়ে; দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই শিবের মন্দির মথুরায় যমুনার ধারে দেখিয়াছি। চারিটি ধারায় জল একসঙ্গে পড়ায় যেন একটি মুকুটের মত দেখিতে হয়। আমরা স্নান করিয়া আসিয়া গোবিন্দজীকে প্রণাম করিতে গেলাম। কিন্তু নিয়ম হইতেছে, মন্দিরে গেলে কিছু ভগবৎসেবা করিতে হয়। অপর কিছু কারবার সুবিধা না হওয়ায় আমরা পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। গরমীকাল, বেলা তখন ১২টা হইয়া গিয়াছে। আমরা কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা অন্যান্য কাজ করিয়া মন্দির ও বিগ্রহ-দর্শন-ঋণ শোধ করিলাম। এইটি বেশ ভাল প্রথা। তাহার পর গোবিন্দজীর প্রসাদ পাইতে

বসিলাম। কামদার বা কর্ম্মচারী, মণিপুরী, এবং আমাদের বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

এই রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডে পাঁচ হাজারের উপর মণিপুর ও টিপারার লোক বাস করে। মণিপুরী ও টিপারার মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সকলকেই আমরা মণিপুরী বলিতাম।

প্রসিদ্ধ পাঁপরের ডালনা

পাকুড় পাতায় করিয়া আমাদের প্রসাদ দিল। এদেশে শালপাতা নাই। উৎকৃষ্ট চাউলের অন্ন, চাপ চাপ কড়ায়ের ডাল এবং পাঁপরের ডালনা আর একটা কিছু তরকারী ছিল। পাঁপরের ডালনা হইল, একরকম বড় ডুমুরের মত গোল গোল নিরেট ফল, খাইতে অনেকটা কাঁঠাল বিচির মত, উহার নাম জানিনা। ঐ ফলটি চারি টুক্‌রা করিয়া ডুমি ডুমি কাটা হয়। ঐ ফলের ডুমি, আলুর ডুমি, ভিজা ছোলা আর পাঁপর দিয়া ডালনা। ইহাকে আমরা পাঁপরের ডালনা বলিতাম। এই জিনিষটি রাধকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডতেই ভাল হয়; অবশ্য উহা রাঁধিবার একটু বিশেষত্ব আছে। অন্যত্র এমন সুস্বাদু হয়না। আমাদের অধিক ক্ষুধা পাইয়াছিল। সেইজন্য ভাত খাইয়া বড় বড় রুটি খানকতক লইলাম ও এইরূপ পাঁপরের ডালনা দিয়া আমরা প্রসাদ পাইলাম। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইলাম।

গোষ্ঠবিহার লীলা দর্শন

গ্রামটি গয়লার গ্রাম ; সেজন্য দুধ তখন খুব সস্তা ছিল। এক ঝোড়া গোবরে একখানা ঘুঁটে তৈরী হয়, সেই একখানা ঘুঁটে দিয়াই সব রান্না হয়। লোকজন খুব সরল এবং আমাদের সহিত বেশ সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পর আর একবার রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডতে যাই। সেদিন গোষ্ঠ ছিল। বাংলা দেশে যে তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়, বৃন্দাবনে সেই তিথিতে (অষ্টমীতে—গোষ্ঠ হয়।)

গরুগুলিকে রঙের পুঁটলি করিয়া ছাপ দেয়। গরুর দুইটি শিঙে ফুলের মালা বা কড়ির ঘেরাটোপ করিয়া পরাইয়া দেয়। গরুকে নূতন ঘাস ও কিছু হালুয়া, পুরী, লাড্ডু খাওয়ায়, এবং সেইদিন গরুকে আর কিছু কাজে লাগায় না। গ্রাম থেকে দূরে একটা তমাল গাছের বাগান বা ঝোপের ভিতর ঠাকুর লইয়া সভা হইল এবং গায়কেরা নানা প্রকার সঙ্গীত করিতে লাগিল। দূর দূর গ্রাম হইতে অনেক লোক দেখিতে আসিল। এদিকে প্রশস্ত মাঠ, ফুল দিয়া সাজান. গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে,—গোষ্ঠবিহার (Pastoral scene) কাহাকে বলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠ দেখিবার সময় এমন ভাব আসে, যেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গরুগুলি ও রাখাল-বালক লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। সেই মাঠ সেই তমালবন, সেই ধেনুগণ ও সেই রাখাল বালক ! ভাবটা বেশ জমিয়া ওঠে।

কুসুম সরোবর ও মান সরোবর

আমরা গাড়ী করিয়া রাধাকুণ্ড ত্যাগ করিয়া কুসুম সরোবর ও গোবর্দ্ধনের দিকে আসিলাম। কুসুম সরোবর—বড় গজগিরি পুকুর (চারিদিকে বাঁধান)। রাস্তাটি পুকুরের কিনারা দিয়া গিয়াছে এবং পুকুরের ওদিকে অর্থাৎ রাস্তার বিপরীত দিকে অনেকগুলি বাড়ীঘর আছে। এই সকল মন্দির হইল ভরতপুরের মহারাজ-দিগের সমাধিস্থল। রাখাল মহারাজ ও হরি মহারাজ এই সকল বাড়ী বা ঘরের কোনও স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তবে কোন্ জায়গাটি ঠিক বলা যায় না। আমি এই স্থানে ভরতপুরের স্থাপত্য পদ্ধতি বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। স্থাপত্যশিল্পের এই সকল গৃহাদি অনুসন্ধিৎসুদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। আমরা সকলে একটা জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলাম। এই স্থানে কাশীমবাজারের মহারাজের একখানি বাড়ী আছে এবং দেওয়ালের গায়ে পাথরের উপর পুত্রশোকের কথা অতি করুণ ভাষায় লেখা আছে। কুসুম সরোবরের পর একটী ছোট রাস্তা। তারপর গোবর্দ্ধনের মন্দির। এই মন্দিরের আরও দূরে পাহাড়ের উপর আর একটী পুরাতন মন্দির আছে। ফটক দিয়া এই বড় মন্দির ও বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে. মাঝখানে একটী ছোট পুকুরের মত রহিয়াছে, অর্থাৎ পাথরের মাঝে জলটা আটকাইয়া আছে। এটাকে মানকুণ্ড বা মানসরোবর বলে। আমি ও কানাই পাথরে বসিয়া এই জলে

পা ডুবাইয়া বসিয়া রহিলাম এবং বেশ আরাম করিয়া মুখ-হাত-পা ধুইলাম। তারপর একটী শিবের মন্দিরে প্রণাম করিতে গেলাম, এবং প্রবাদ অনুযায়ী লালাবাবু বৈরাগ্য-অবস্থায় যে ঘরটীতে বসিয়া সাধন-ভজন করিয়াছিলেন সেই ঘরটীকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দূরে পাহাড়ের উপর শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দেখা যায়; তাহা দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম এই মন্দিরে যাত্রী সর্ব্বদা যায় না। ইহা অপরিষ্কার অবস্থায় রহিয়াছে।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমা

আশৈশব শুনিয়াছি গোবর্দ্ধন অতি পবিত্র স্থান। মন্দিরেও যাইতে হইবে এবং পাহাড়েও পা দিতে হইবে। শুধু পা, বালিতেও পা তাতিয়া উঠিল, কারণ সময়টা গরমীকাল ছিল এবং বেলাও প্রায় ৩টা হইবে। অবশেষে সেই স্থানকে প্রণাম করিতে করিতে মন্দিরের মেঝেতে উপস্থিত হইলাম। মেঝেকে তথা সমগ্র মন্দিরকে প্রণাম করিয়া বিগ্রহকে প্রণাম করিলাম। তথায় অল্পক্ষণ বসিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। বড় পাহাড়টা আরও দূরে। গরমীকালে একদিন রাত্রে এই পাহাড়টা পরিক্রমা করা হয়।

নন্দগ্রাম ও বর্ষাণার বিষয় বলিবার সময় একটু চাপল্যের উদয় হইয়াছিল। নন্দগ্রাম ও বর্ষাণার ভাব হইল চাপল্যের ভিতর দিয়া শ্রদ্ধাভক্তি—এইজন্য এইস্থানে ভাবপ্রবণতা আসে।

কিন্তু গোবর্দ্ধন ও কুসুম-সরোবরের ভাব অন্যবিধ ; স্থানটি অতি গম্ভীর, কোন প্রকার চাপল্য বা ভাবপ্রবণতা যেন আসিতে দেয় না। এইস্থলে বহুকাল হইতে বহু তাপস সাধু তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। অদ্যাপি অনেক তাপস সাধু এই স্থলে তপস্যা করিয়া থাকেন। পরস্পরে গল্প বা চাপল্য তত নাই। সকলেই যেন অল্পভাষী, নিজ নিজ জপধ্যানে ব্যস্ত। মাধুকরী করিয়া কিছু আনেন ও খাইয়া থাকেন। এইস্থানটি হইল ধ্যানীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এইখানে গেলেই গভীর ধ্যানের ভাবটা আসিয়া পড়ে। ইহা কোন চাপল্য বা ভাবপ্রবণতার কথা নহে, যথার্থ যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই এই স্থলে বর্ণনা করা হইল। আমরা হাত-পা ধুইয়া এক এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া গেলাম।

স্থানটাতে শক্তি যেন পূর্ণভাবেই রহিয়াছে। বেশ বুঝা যায়, যেন এখানকার হাওয়াটাই অন্য রকম এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও তদনুযায়ী। স্থানীয় গম্ভীরভাব আমাদিগকে গম্ভীর করিল, তাই পরস্পরে আর বিশেষ কথা কহিতে পারিতে-ছিলাম না।

তথায় গোবর্দ্ধনকে গিরিরাজ বলা হয়। সেখানকার একটা প্রথা আছে যে, সমাগত তীর্থযাত্রীদিগকে পাহাড় হইতে ছোট ছোট পাথর তুলিয়া একটি মন্দির তৈরী করিতে হয়। কেহ বাপের নামে, কেহ মায়ের নামে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে এবং ফুল, পাতা ইত্যাদি পাওয়া গেলে পূজাও করা হইয়া

থাকে। কেহ কেহ বা মন্দির-প্রতিষ্ঠার দক্ষিণা স্বরূপ পাথরের ভিতর একটি পয়সাও দিয়া থাকে। হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বরের মন্দিরের কাছে ঠিক এইরূপ পাথর দিয়া মন্দির গড়িবার প্রথা আছে। পাথর কিন্তু অপরে আগাইয়া দিলে লইতে নাই। নিজে পাথর সংগ্রহ করিয়া এই মন্দির বা স্তূপ তৈরী করিতে হয়। অপরের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিলে মন্দির তাহারই হইয়া যায়। এই মন্দির বা স্তূপ নির্ম্মাণ হইল বৌদ্ধপ্রথা। পারস্য দেশে পর্য্যটনকালে আমায় তথাকার কয়েক জায়গায় এইরূপ করিতে হইয়াছিল। বুঝা যাইতেছে, বৌদ্ধপ্রথা বহুদূর বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল। এই স্তূপ নির্ম্মাণকালে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। মনে মনে সমস্ত সংকল্প করা যাইতেছে অর্থাৎ অল্পের ভিতর কল্পনাতে মনের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়া লওয়া হয়। আর এক কথা, এই গিরিরাজের শিলাখণ্ড অন্য জায়গায় লইয়া যাইতে নাই, মাত্র বৃন্দাবন পর্য্যন্ত কেহ লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু নিত্যপূজা করিতে হইবে। শালগ্রাম শিলার যেরূপ পূজার ব্যবস্থা, এই গিরিরাজ শিলা-খণ্ডেরও তদ্রূপ পূজার ব্যবস্থা। একবার কোন গাড়ীর গাড়োয়ান এক বৃদ্ধ মুসলমান ছিল। সেই গাড়ীর যাত্রী, দেশে তাহার মাতা শিলাখণ্ড পূজা করিবেন এই উদ্দেশ্যে দু-একটি শিলাখণ্ড লইয়া-ছিল। বৃদ্ধ মুসলমান ধমক দিয়া বলিল, "এমন কাজ ক'রবেন না। গিরিরাজের পাথর অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে নেই। ওতে অনাচার ও অমঙ্গল হবে।" কাজেই সেই ব্যক্তি পাথরগুলি

রাখিয়া দিল। দেখিলাম মুসলমানরাও গিরিরাজের পাথরকে এইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করে।

এই গোবর্দ্ধন হইতে একটি বালির মাঠ বা খালি জমি বরাবর চলিয়া গিয়াছে। বালি জিভে দিয়া দেখিলাম যে, নদীর বালি। ভাগবতে আছে যে, যমুনা আগে গোবর্দ্ধনের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইত। বৃন্দাবন পরিক্রমাকালে মাঠের মাঝে বালির ভিতর ঘাটে নামিবার সিঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা হাঁটিতে পারে তাহারা বৃন্দাবন হইতে নদী-বুজান বালির মাঠটা দিয়া গোবর্দ্ধনে চলিয়া যায়। এই বালির পথ লইলে দশ-বারো মাইলের ভিতর গোবর্দ্ধন পাওয়া যায়। এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, ভাগবত লিখিবার সময় যমুনার স্রোত এইদিকে বহিত।

মথুরার দিকে

আমরা গোবর্দ্ধন ছাড়িয়া মথুরার দিকে আসিতে লাগিলাম। পথে একটা আধশুকনা পুকুর, একটা ভাঙ্গাবাড়ী এবং ঝোপ জঙ্গল দেখিতে পাইলাম। প্রবাদ আছে, এই স্থলে ভীষ্মের পিতা শান্তনু উদ্যানবাড়ী করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে কোন নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমরা সেখানে প্রণাম ও পূজা করিয়া আসিলাম। যে সকল ময়ূর মাঠে চরিতেছিল, সন্ধ্যা হওয়ায় তাহারা অনেকে উড়িয়া আসিতে লাগিল। বড় বড় ল্যাজ, প্রশস্ত পক্ষদ্বয়, যে যার গাছের

ডালেতে আসিয়া বসিল। ময়ূরও যে অনেক দূর উড়িতে পারে তা এইখানে দেখিলাম।

এই স্থানটাতে রাত্রিতে মাঝে মাঝে বড় ডাকাতি হয়। এইজন্য রাত্রে অতি শঙ্কিতচিত্তে যাইতে হয়।

যাহা হউক, বেলা থাকিতে থাকিতে আমরা মথুরার ভূতেশ্বরের মন্দিরে আসিলাম। এবং সেই রাত্রে মথুরায় থাকিয়া পরদিন প্রাতে বৃন্দাবন আসিলাম। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি স্থান চাপল্য মিশ্রিত শ্রদ্ধাভক্তির উদ্রেক করে। গোবর্দ্ধন, কুসুম সরোবরাদি স্থান, ভক্তি-সংযুক্ত গভীর ধ্যানের ভাব লইয়া আসে। একস্থান অন্যস্থান অপেক্ষা ন্যূন এমন কথা আমি বলিতেছি না। স্থানভেদে ভাবভেদের কথাই মাত্র বলা হইল। যার যেমন ভাব, তার কাছে তেমন ভাবের স্থানই প্রিয়তর বিবেচিত হইবে। আমার দুইটি স্থানই ভাল লাগে এবং আমাদের সকলেরই দুই জায়গায় দুইপ্রকার ভাব অনুভূত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন ও কুসুম সরোবর সমধিক মনোরম স্থান। গিরিরাজ, কুসুম সরোবর, নন্দগ্রাম এবং বর্ষাণাকে শত শত প্রণাম।

"জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা ;
জয় গোবর্দ্ধন—চেতন শীলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !
চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন-কুঞ্জবন—ব্যাপিত বেণু।

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !
"খেলা খেলা—খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক-ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !"

বাজার-চলন ভক্ত

সাধারণ লোকের ধারণা যে, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং সেই সব গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করাই ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু। কখনও বা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কথা ও নাম উল্লেখ করিয়া দুই চারিটি ভাব উদ্ধৃত করাই হইল বড় কাজ। কারণ, লোকের ধারণা যে, সংস্কৃত ভাষায় দু চারটী কথা না বলিলে ধর্ম্মজ্ঞতা আংশিকভাবেও পরিস্ফুট হয় না; তদুপরি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামটাও উল্লেখ করা চাই। বক্তার যে-কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার বেলা কোন একজন প্রসিদ্ধ লোকের অনুরূপ বাণী দ্বারা সমর্থন করা যেন অপরিহার্য্য। ইহা হইলে শ্রোতা-দিগের ভিতর কেহই দ্বিরুক্তি করিতে পারে না এবং সকলেই সেই ব্যক্তিকে মহাজ্ঞানী ও উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া গণ্য করে। ইহা হইল বাজারচলন ভক্তমহাশয়দিগের ভিতর প্রচলিত প্রথা।

গুণবদ্ধ জ্ঞান

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ইহা 'গুণবদ্ধজ্ঞান' কি 'গুণাতীত জ্ঞান' ? দু'পাঁচখানা সংস্কৃত গ্রন্থ পড়া ও প্রসিদ্ধ লোকের দুই চারিটী

কথা তোলায় সেই ব্যক্তির নিজের কী হইয়াছে? এই হইল প্রশ্ন। একটা 'কলের গান'ও (Gramophone) এইরূপ বচন শুনাইতে পারে। আবার যদি উদ্ধৃত বচন সকল প্রমাণ করা যায় যে, যে গ্রন্থের বচন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে উহা সে গ্রন্থে ঠিক নাই বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উদ্ধৃত বাণী ঠিক হয় নাই, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সমস্ত তর্কযুক্তি পণ্ড হইয়া যায়। এই গুণবদ্ধজ্ঞান লইয়াই জগতে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে এবং নানা বিদ্বেষভাব, জয়-আকাঙ্ক্ষা, মানসম্ভ্রমের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে; অর্থাৎ হিংসা-দ্বেষের ভাবটা বিভিন্ন আবরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কেবল ভাবটা একটু পরিমার্জ্জিত। এই হইল 'গুণবদ্ধ-জ্ঞান'। ইহাতে কিঞ্চিৎ উপকার আছে সত্য, কিন্তু আসল জিনিষ কিছুই নাই। ইহাকে বলে মজলিসি পণ্ডিত, কেবল বাক্যবাগীশ, ভিতরে কিন্তু জিনিষ নাই কিছুই। ইহারা হইল বাজার-চলন, ব্যবসায়ী পণ্ডিত বা বিজ্ঞ ব্যক্তি। চলতি কথায় ইহাকে 'কথার ভট্‌চাজ্যি' বলে।

গুণাতীত জ্ঞান

আর এক প্রকার জ্ঞান আছে তাহাকে 'গুনাতীত জ্ঞান' বলে। এই 'গুণাতীত জ্ঞানে' তর্ক-বিতর্ক ও কথাবার্ত্তার কোন আবশ্যকতা নাই। ইহা হইল ভিতরকার বিষয়, যথার্থ দর্শনের বিষয়। এই গুণাতীত অবস্থার আবরণী বা আকর্ষণী শক্তিকে অপর ভাষায় 'হ্লাদিনী' 'সন্ধিনী' 'সম্বিৎ' বলে। এই গুণাতীত জ্ঞান যাঁহারা

পাইয়াছেন তাহাদের দু'তিনটি কথাই হৃদয়স্পর্শী এবং সেই সকল কথা চিরকাল স্মরণ থাকে : যখনই সেই সকল কথা স্মরণ করা যায় তখনই ভিতরে একটা আনন্দ আসে। কিন্তু গুণবদ্ধ জ্ঞানের কথা দু'একবার বলিলেই একটা বিরক্তি ও বিদ্বেষের ভাব আসে। এই হইল দুই শ্রেণীর ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য।

মেদিনীপুর নিবাসী বৈরাগী

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে আমি দুই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যাহারা যথার্থই শান্তি পাইয়াছিল। তাই তাহাদের বিষয় কিছু উল্লেখ করিতেছি। বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম তখন কালা-বাবুর কুঞ্জের বাহির বাড়ীতে ছিল। আমরা কয়েকজন সেবাশ্রমে বাস করিতাম। গৃহাভ্যন্তরে অনেক রোগী থাকিত এবং বাহিরের রোগীও চারিশত হইতে সাড়ে চারিশত আসিত। একটি রোগীর প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সে ব্যক্তি জাতিতে মাহিষ্য। মেদিনীপুরের কোন স্থানে তাহার আদি নিবাস এবং বৃন্দাবনে আসিয়া সে বৈরাগী হইয়াছিল। আমরা তাহাকে বাবাজী বলিয়া ডাকিতাম। সেবাশ্রমের নিয়ম হইল—সকালে প্রথমে রোগীদের ঔষধ দেওয়া, তারপর সকলকে দুধ-সাগু খাওয়ান, মধ্যাহ্নে অর্থাৎ বেলা ১১টার সময় প্রত্যেককে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ্য দেওয়া। এই হইল সাধারণ নিয়ম। সেবাশ্রম হইল ঠিক যমুনার কিনারায়, স্থান হইল বংশীবট যমুনাতট। স্থানটি অতি সুরম্য এবং উঠানে কিছু ফুল গাছ ও তুলসী গাছ

ছিল। মেদিনীপুরের নিরক্ষর বৈরাগীটি সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া রাত্রিবাসের কাপড় ত্যাগ করিত। ঔষধ বা সাগু কিছুই খাইত না এবং সেজন্য তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়িও করা হইত না। বাবাজী সকালে গিয়া উঠানে সেই তুলসী গাছগুলি পরিক্রমা করিত এবং ধীরে ধীরে হাত-তালি দিয়া মৃদুস্বরে "হরিবল, হরিবল, হরিবল" বলিত। এইরূপে সকাল হইতে বেলা ৯টা ৯।।টা অবধি সে তুলসী গাছ পরিক্রমা করিত এবং মুখে "হরিবল" বলিতে বলিতে হাতে তালি দিত। কারুর দিকে চাওয়া নাই, কাহারও সাথে কথা বলা নাই। তাহার মুখ চোখ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। মুখ দিয়া যেন একটা আনন্দ ও শান্তির রশ্মি বাহির হইত। তারপর সে নিজের স্থানে যাইয়া যথা সময়ে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ্য, সাগু ও ঔষধ খাইয়া উঠানে বা অন্য জায়গায় বসিয়া থাকিত। কাহারও সহিত বিশেষ গল্প বা কথাবার্ত্তা কহিত না। আমি কখনও কখনও গিয়া তাহার সঙ্গে কাথাবার্ত্তা কহিতাম কিন্তু দেখিতাম যে, তাহার মনের ভাব অতি ধীর ও শান্ত এবং কথাগুলি অতি মিষ্ট ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে পরিপূর্ণ। সেইজন্য সেই বাবাজীকে আমরা বিশেষ করিয়া স্নেহ ও যত্ন করিতাম। ব্রহ্মচারী প্রাণেশ কুমার সেই সময় অদ্বৈত-বাদের অনেক গ্রন্থ ও বেদান্তের নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত এবং অদ্বৈতবাদের কথা সর্ব্বদাই তাহার মুখে লাগিয়া থাকিত। পণ্ডিত লোক, সকলেই তাহাকে সমীহ করিয়া চলিত। আমি 'চবুতরে' অর্থাৎ ভিতরকার মন্দিরে ঢুকিবার দরজার পশ্চিমদিকে

যে চাতালটি ছিল সেইখানে বসিয়া থাকিতাম এবং সেই বাবাজীকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতাম। একদিন সকালে প্রাণেশ আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "প্রাণেশ, তুমি ত অদ্বৈতবাদের ঢের চর্চ্চা কর, তর্কযুক্তিও ঢের কর, কিন্তু ঐ বাবাজীর মুখের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, ও ত সামান্য তুলসী-গাছ পরিক্রমা করিতেছে ও মুখে 'হরিবল হরিবল' বলিতেছে—তুলসীগাছই হইল এর ইষ্ট—বল এ শান্তি পেয়েছে কি না? এর বিদ্যা নেই, নিরক্ষর লোক, বড় কথা কিছু জানেনা এবং কাহারও সহিত তর্ক-বিতর্কও করে না। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখ দেখি, লোকটা শান্তি পেয়েছে কি না?" প্রাণেশ খানিকক্ষণ সেই লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল এবং অবশেষে বলিল, "লোকটি যথার্থই গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছে, ভিতরে একটা শান্তি এসেছে।" এই অবস্থা তর্ক-বিতর্কে লাভ হয় না—ইহার উপায় অন্যপ্রকার। তর্কযুক্তিতে অন্যভাব লইয়া আসে। লোকটি একনিষ্ঠভাবে এই তুলসীগাছ পরিক্রমা করিয়া এবং তুলসীগাছকে ভগবানের প্রতীক মনে করিয়া স্বগুণ ঈশ্বর হইতে নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে যাইতেছে। তাহার ভিতরে যথার্থই একটা উচ্চভাব ও উচ্চধারণা জন্মিয়াছিল। এটা সে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিত না, কারণ তাহার সারাদিনের কথাবার্ত্তা ও আচরণ অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবস্থা দেখিয়া এই বুঝা গেল যে, তুলসীগাছকে একনিষ্ঠভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া পূজা করিলেও শান্তিধামে উপনীত হওয়া যায়। এই

বাবাজীর নিকট হইতে আমি ইহাই শিক্ষা পাইয়াছি। ধন্য বাবাজীর জীবন! ধন্য বাবাজীর শুদ্ধাভক্তির সাধন!

নোয়াখালির জেলে-বৈরাগী

বৃন্দাবনে আর একটি দীর্ঘাকৃতি উজ্জ্বলবর্ণ বৃদ্ধ বৈরাগী ছিল। তাহার প্রায় সব দাঁতই পড়িয়া গিয়াছিল। শীতকালে শেষ রাত্রে আসিয়া সে বাড়ীর পাশে যমুনাতে, অর্থাৎ বংশীবটের ঘাটে স্নান করিত। বৃন্দাবনের শীত অতি প্রবল। আমি ও ব্রহ্মচারী প্রাণেশ সদর দরজার কাছে রাস্তার দিকে একটা ঘরে শুইতাম। রাস্তার দিকে একটা ছোট জানালা ছিল; এই ঘরটিকে ভেটঘর বলিত। সেই দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি রাস্তার দিকে আসিয়া শেষ রাত্রে হরিনাম স্তব বা ভজন খানিকক্ষণ শুনাইয়া চলিয়া যাইত। বৈরাগীটি কয়েকদিন পরে একদিন বেলা করিয়া আসিল এবং করজোড়ে অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিল যে, সে জানালার কাছে ভজন শুনাইয়া আমাদের ত কোন ঘুমের ব্যাঘাত করে নাই? কথাগুলি অতি মিষ্ট ও বিনয় নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "বাবাজী এতে কোন সঙ্কোচ ক'র না। শেষ রাত্রে তোমার ভজন শুনে আমরা খুব আনন্দিত হই। তুমি রোজই আমাদের ভজন শুনিয়ে যেও।" কিন্তু সেই ব্যক্তির ভাষা খাস নোয়াখালির হওয়ায় সকল কথার ভাব ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আশ্রমে চিন্তাহরণ নামক একটি যুবক-কর্ম্মী ছিল। সে নোয়াখালির

ভাষা বেশ জানিত। বাবাজীর কথা আমাদের বেশ বুঝাইয়া দিল। লোকটি চলিয়া গেলে চিন্তাহরণ আমাদের বলিল যে, লোকটি জাতিতে জেলে, বাড়ী নোয়াখালিতে। শেষ রাত্রে বাঁক কাঁধে করিয়া বাজারে মাছ লইয়া যাইত এবং সমস্ত পথ হরিনাম করিতে করিতে যাইত। পথে এক থানা পড়ে। থানার দারোগা ও পাহারাওলাদের তাহাতে ঘুমের ব্যাঘাত হইত। একদিন দারোগা পাহারাওলাদের হুকুম দিল যে, ঐ লোক চীৎকার দিলে থানায় তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিবে। পরদিন রাত্রে সে যখন হরিনাম করিয়া যাইতেছিল তখন পাহারাওলারা তাহাকে ধরিয়া থানাদারের কাছে লইয়া গেল। থানাদার সক্রোধবচনে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বলিল যে, চীৎকার করিয়া সে কেন সকলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়, এইজন্য তাহাকে বিশেষ দণ্ড পাইতে হইবে। জেলেটি বিনীতভাবে বলিল, "সারা জীবনটাই ত ঘুমিয়ে অচেতন রয়েছেন, হরিণাম শুনিয়ে শেষকালটায় যদি একটু ঘুম ভাঙ্গাতে পারি ত তা মন্দ, না ভাল? হরিনাম শুনে যদি একবারও ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠেন তবে সেটা কি ভাল কাজ নয়?" দারোগা—ব্রাহ্মণ, শুনিয়া ত চমকিয়া উঠিল। সেই দিন হইতে পাহারাওলারা সেই জেলেকে আর কিছু বলিত না। এইরূপে কিছুদিন গেলে তথাকার সকলে বলিল, "তুমি জেলেগিরি ক'রবে আবার হরিনামও ক'রবে, এ দু' কাজ এক সঙ্গে চলে না; তুমি মাছবেচা ছেড়ে দাও এবং বৃন্দাবনে গিয়ে রাধারাণীর শরণাগত হও।" লোকটি অগত্যা মাছের ব্যবসা ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বৈরাগী হইল।

গোবিন্দজীর বাজারে যাকে 'বিল্বমঙ্গলের সমাধি বাড়ী' বলা হয়, সেইখানে সদর দরজার দেউড়িতে সে থাকিত। তাহার সম্বল হইল একটি কি দুইটি কৌপীন, একখানি পরিধেয় বস্ত্র, একখানি জার্ম্মান সূতার কম্বল (দশ আনায় যে কম্বল পাওয়া যেত) এবং ছোট একটি তামার লোটা। এই বাবাজীটি দিনে একবার করিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও অভিবাদনাদি করিয়া যাইত। আমরা তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া একদিন আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলিলাম। কিন্তু সে করজোড়ে বলিল, "রাধারাণী ত আমার কিছু অভাব রাখেন নাই। আমি রোজ খাই এবং পেট ভরিয়াই খাই।" ভিতরে ঠাকুর বাড়ী বা কুঞ্জ হইতে তাহাকে অনেকবার প্রসাদ পাইবার জন্য বহু অনুরোধ করা হইল কিন্তু তাহার একটি কথা, "রাধারাণী ত আমার কিছু অভাব রাখেন নাই।" এই বাবাজীটি বেলা ১১টার সময় যখন যে মন্দিরে ইচ্ছামত উপস্থিত হইত তখনই সেই মন্দিরের লোকেরা অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তাহাকে ভোজন করাইত। এইজন্য তাহার আহারের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিলনা ! একদিন তাহার কম্বলখানি চুরি হইয়া গেল। সেবাশ্রমে আমরা সংবাদ পাইয়া তাহাকে একখানি কম্বল দিতে প্রয়াস করিলাম। কারণ সেবাশ্রমে রোগী ও আর্ত্তদিগকে দিবার জন্য অনেক কম্বল থাকিত। কিন্তু সেই বাবাজী জোড়হাত করিয়া বলিল, "রাধারাণী ত আমার কিছুই অভাব রাখেন নাই ; আমি কাপড় খানিকটা পরি ও বাকীটা রাত্রে গায়ে দিয়া থাকি। এতেই শীত কাটিয়া

যায়।" তারপর তার লোটাটিও চুরি হইল। সেবাশ্রমে অনেক লোটা ছিল; আমরা তাহাকে একটা লোটা দিবার বিশেষ প্রয়াস করিলাম। কিন্তু বাবাজীর সেই একই কথা, "রাধারাণী ত আমার কিছুই অভাব রাখেন নাই। এই হাতের আঁজলা করিয়া জল খাই, এতেই আমার তেষ্টা নিবারণ হয়। আমার লোটার কোন আবশ্যক নাই।" এইরূপে আমরা তাহাকে পয়সা, কাপড়, বা দুখানা রুটী দিবার ঢের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তাহার একই কথা ছিল। জগৎটা সে পরিপূর্ণ দেখিত, অপূর্ণভাব তাহার কিছুই ছিল না। তাহার হৃদয় শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এইজন্য তাহাকে আমরা কখনও কিছু গ্রহণ করাইতে পারি নাই। অবশেষে আমরা ক্ষুণ্ণমন হইয়া স্বীকার করিলাম যে, বাবাজী জিতিয়াছে, আমরা হারিয়াছি। বাবাজী বড়, আমরা ছোট।

আমি মাঝে মাঝে গোবিন্দজীর বাজারের বাড়ীতে তাহাকে দেখিয়া আসিতাম। দেখিতাম যে, সে দরজার দেউড়ির উপর হাঁটু দুইটি উঁচু করিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া হাঁটুর উপর রাখিয়া অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন অবস্থায় স্থির, ধীর, নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছে। যেন নিতান্ত তন্ময়। কোন কথা কহিত না, আমিও তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না। কারণ তাহা হইলে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সে মহাধ্যাণী ছিল এবং যথার্থই সেই লোকটি যে শান্তি পাইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার নাই। এই দুইটি বৈরাগীর কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইল যে, হীনকুলজাত বা অশিক্ষিত বলিয়া

কাহাকেও ঘৃণা করিবার নাই। উপনিষদ্ ও বেদান্ত না পড়িয়াও মানুষ শান্তি পাইতে পারে।

শান্তি বা ব্রহ্মলাভে কোন গণ্ডী নাই

এখন কথা হইতেছে, শান্তি কোথায় পাওয়া যায়? তাহার পরিমান ও পরিধি কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত? কয়েকখানি গ্রন্থ পড়িয়া ও প্রসিদ্ধ লোকের বাণী উল্লেখ করিয়া শ্রোতাকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সেই ব্যক্তি কি শান্তি পাইয়াছে? দু'চারখানি বই না পড়িলে কি শান্তি আসে না? বড় বড় কথা উদ্ধৃত না করিতে পারিলে কি শান্তি পাওয়া যায় না? এইস্থানে তর্কযুক্তির কোন স্থান নাই, বিদ্যাবুদ্ধির কোন গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। পণ্ডিত্যের কোন রেখা নাই—ইহা এক স্বতন্ত্র বস্তু এবং অপর সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শান্তি বা ব্রহ্মলাভে সকলেরই অধিকার আছে। পথ কাহারও জন্য বন্ধ নহে। পথ সকলেরই জন্য সব সময় খোলা। প্রবল ইচ্ছা থাকিলে এবং নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করিলে সকলেই গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে। এইস্থলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদ হেতু কিছুই আসিয়া যায় না। শান্তি বা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত জাতি-বর্ণ, বংশ-মর্য্যাদা ও বিদ্যাবুদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই। ইহা এক স্বতন্ত্র বস্তু। ইহাতে কাহারও বাধা নাই এবং হীন অবস্থার লোকও শান্তি বা ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। এইজন্য উপরোক্ত দুইটি বাবাজীর বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। আমার পরিচিত মাত্র

দুইটি লোকের উল্লেখ করা হইল, কিন্তু আরও যে কত লোক আছেন সে বিষয় কেই বা জানে? যাহা হউক, নিম্নবর্ণ অশিক্ষিত বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে নাই। শান্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান সকলেরই হইতে পারে।

সাধনা ও সাধকের অবস্থা

সাধক কিছুদিন একনিষ্ঠ হইয়া ধ্যান-জপ করিলে তাহার মন যখন সূক্ষ্মস্নায়ুতে প্রবেশ করে, তখন তাহার ভিতর হইতে একটা আভা বহির্গত হয়। ইহা অলক্ষিত, কিন্তু অপর বিচক্ষণ সাধক এই আভা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন। কুকুর, গরু ও শিশুরা এই আভা স্পষ্ট বুঝিতে পারে। এইজন্য এই তিন শ্রেণীর প্রাণী প্রথমেই সাধকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ, এই তিন শ্রেণীর প্রাণীর ভিতর এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ শক্তি আছে যে, তাহারা উহার দ্বারা ঐ বিশিষ্ট কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। দুষ্ট প্রকৃতির লোকের ভিতর হইতে কৃষ্ণবর্ণের বা মলিন বর্ণের আভা বহির্গত হয়, তাহা অতি কর্কশ ও অশান্তিকর। সাধকের গা হইতে যে আভা নির্গত হয় তাহা স্নিগ্ধ, মধুর ও চিত্তাকর্ষক। বিজ্ঞান ইহাকেই Rhythmical vibration বা সাম্যস্পন্দন বলে; দুর্বৃত্ত লোকের ভিতর হইতে যে আভা বাহির হয় তাহা অসাম্য স্পন্দন (Unrhythmical vibration)। সাধক বা দুষ্টলোক পরীক্ষা করিতে হইলে এইটি দ্বারা তাহার লক্ষণ নির্ণয় করিতে হয়।

মাধুর্য্য বা আকর্ষণী শক্তি

সাধকের গা হইতে যে আভা বাহির হয় তাহা কি প্রকারের ? প্রথম অবস্থায় সাধকের গা বা মাথা হইতে ইঞ্চি কতক পরিমিত যেন একটা দণ্ড বাহির হয়, অর্থাৎ সুষুম্না হইতে সহস্রারের উপর দিয়া অল্পপরিসর একটা অলক্ষিত শক্তি বা জ্যোতিঃ বাহির হয়। সেই জ্যোতিঃ বা আভা তাহাকেই আবরণ করিয়া রাখে। ইহাতে সে নিজেই শান্তি পায় এবং তন্ময় হইয়া থাকে। এই আভাটিকে বা আবরণী শক্তিকে ছত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই ছত্রের ভিতর এক ব্যক্তি বাস করিতে পারে, তাহাতেই তার শান্তি ও পূর্ণত্ব লাভ হয়— অধিকতর আকাঙ্ক্ষা নাই, অধিকতর শক্তি নাই। অপরে সেই ছত্রের ভিতর আসিয়া আশ্রয় লইতে পারে না। এই শ্রেণীর সাধক অপরকেও সেই আভার ভিতর লইতে পারে না। কিন্তু যাহাই হউক, সে যে শান্তি পাইয়াছে এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নিজেই পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং নিজেই শান্তি ও পূর্ণত্বে বিভোর হইয়া আছে। সেই ব্যক্তি শান্তি ও পূর্ণত্ব পাইয়াছে কি না এই বিষয়ে তর্ক করা নিতান্ত ভ্রম, কারণ শান্তি ও পূর্ণত্বের কোন সীমা নাই। যেখানে বিপরীত ভাব সংমিশ্রণ হইয়া একীভূত হয় সেখানেই শান্তি, সেখানেই পূর্ণত্ব। এই স্থানই হইল তাহার পক্ষে দ্বন্দ্বাতীত বা সাম্য অবস্থা। তর্ক-বিতর্ক বা যুক্তির সহিত এর কোন সম্পর্ক নাই। সাধক সাধকের ভাবে

চলে, আর 'কথার ভট্চাজ্যি' কথা বেচিয়া মরে। আবার এক শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁহার ভিতর এই ছাতা বা আবরণী একটু বড় হইয়া থাকে। তাহাতে তিনি নিজেও থাকিতে পারেন এবং আরও পাঁচজনকে ভিতরে আশ্রয় দিতে পারেন, অর্থাৎ সকলেই এই আবরণী শক্তির পূর্ণ-শান্তি পাইতে পারে। এই আবরণী শক্তিকে Parabolaর * সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই ছত্র বা আবরণী শক্তিকেই অপর ভাষায় মাধুর্য্য বলা হয়।

অনাদি লিঙ্গ

আর এক প্রকারের উচ্চমার্গের সাধক আছেন। তাঁহাদের ভিতর সহস্রার হইতে এক রেখা বা জ্যোতিঃ বহু উচ্চে ওঠে এবং তথা হইতে জ্যোতিঃ বিকীরিত হইয়া ছত্রের ন্যায় আবরণী শক্তি হয়। তাহার ভিতর স্বয়ং সাধকও থাকিতে পারেন এবং বহু সহস্র লোকও আশ্রয় ও শান্তি পাইতে পারে। শ্রেষ্ঠ অবস্থার সাধক হইল, যাঁহার সহস্রার হইতে শক্তি উর্দ্ধদিকে যায় এবং সেই শক্তির যে আবরণী বা ছত্র হয় তাহার ভিতর সমস্ত জগদ্বাসী আশ্রয় ও শান্তি পাইতে পারে। এই সকল ব্যক্তিকে যুগপ্রবর্ত্তক বলে। সহস্রার হইতে সুষুম্নার ভিতরকার যে শক্তি তাহা উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া 'অনাদি লিঙ্গ' বা 'জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ' হয় এবং তথা হইতে যে শক্তি বিকীরিত হয় তাহাকে ছত্র বা

* ক্ষেপণী।

আবরণী শক্তি বলে। সুষুম্নার ভিতর হইতে শক্তি সহস্রারের ভিতর দিয়া যাইয়া যে রেখা অনাদি লিঙ্গ বা জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ হয়, ইহাকে অপর ভাবায় 'নিত্য' বলা হয় এবং এই অনাদি লিঙ্গ হইতে যে শক্তি বিকীরিত হয় তাহাকে 'লীলা' বলে। শক্তিকে অর্থাৎ অনাদি লিঙ্গস্থিত বিকীরিত ভাব দর্শন করিয়া উভয়রূপে সাধক নিজের ভাব বিকাশ করিবার জন্য এই শক্তিকে নানা শব্দ দিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। চলিত কথায় অনাদি লিঙ্গ ও আবরণী শক্তি এই দুই লইয়াই বহুবিধ ভাব ও শব্দ সৃজিত হইয়াছে। যথা, সৎলোক, সাধুলোক, সাধকলোক, খণ্ড-অবতার এবং পূর্ণ-অবতার ইত্যাদি। এই সকল নামবাচী শব্দ সকল ভাষায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ হইল এই যে, আবরণী শক্তি তাহার কতটা হইয়াছে তাহাই নির্দ্দেশ করা। কিন্তু এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি নিজের মতন যে আবরণী শক্তি পাইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক বা তাহার কিছু হয় নাই। সে শান্তি পাইয়াছে, পূর্ণত্ব পাইয়াছে। তাহার বুক আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। এর চেয়ে আর কিছু আকাঙ্ক্ষার বা অপরকে কিছু দেওয়ার নাই বটে, কিন্তু নিজে সে শান্তি পাইয়াছে এবং তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছে। এই জন্য শান্তি-লাভের কোন সীমা বা পরিধি নাই। যেখানে বিপরীতভাব একীভূত হইয়া যায় অর্থাৎ নির্দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় আসে সেখানেই সে শান্তি পায়।

বৈরাগীদের সম্পর্কে দেখা গেল যে, তুলসীগাছ প্রণাম ও

পরিক্রমা করিয়া শান্তি পাওয়া যায়, কিন্তু 'কথার ভট্চাজ্যি'র সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। গুণবদ্ধ ও গুণাতীত জ্ঞানের মধ্যে এই বিশেষ পার্থক্য। গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ও তর্ক করিয়া কেবলমাত্র গুণবদ্ধ জ্ঞান হয়, কিন্তু অপর পন্থায় যাইলে গুণাতীত জ্ঞান হয়। এইজন্য বাবাজীদের বিষয় বর্ণনা করা গেল।

মথুরা

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থানকালে মথুরায় আমাদের একটি থাকিবার স্থান হইল। অবিনাশ চন্দ্র দাস নামে একটি ডাক্তার আমাদিগকে থাকিতে দিলেন, এবং তিনি খুব আত্মীয় হইয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য আমরা কখনও বৃন্দাবনে কখনও বা মথুরায় থাকিতাম। তাঁহার আবাসস্থান হইল মানিকচক চৌবে পাড়া, অর্থাৎ দ্বারকাজীর মন্দিরের পাশ দিয়া যে গলিটা সেই গলির ভিতর ; দ্বারকাজীর মন্দিরের পিছনে দু' একখানি বাড়ীর পর। এখানে যমুনা, বড় সড়কের পারে অর্থাৎ আমরা যেখানে থাকিতাম সেখান হইতে দুই রশি তফাত।

কংসের রাজধানী

মথুরায় থাকিবার সময় ব্রহ্মচারী প্রাণেশ, কানাই ও আমি তিনজনে কংস-টিলা দর্শন করিতে যাইতাম। এই স্থানটি হইল মাণিকচকের কাছে। বাজার হইতে উঁচু টিলার দিকে একটা রাস্তা আছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত গাড়ী যাইতে পারে।

তারপর একটা চ্যাপটা সমতল মাঠের মত স্থান। এই

স্থানটি বর্ত্তুলাকার। তিন দিকে উঁচু পাহাড়, টিলার মত। একদিকে যমুনা, অপরদিকে এই প্রশস্ত টিলা, মধ্যস্থান কিছু নিম্ন; এই স্থানটি মথুরার মধ্যে অতি সুন্দর স্থান। জনপ্রবাদ—এই স্থানে কংসের বাড়ী ছিল। এখন এইটি একটি বড় পাড়া হইয়া গিয়াছে। এখানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক বাস করে এবং কয়েকটি মন্দিরও আছে।

গ্রীষ্মকালে সহরের কোথাও হাওয়া না থাকিলে এইস্থানে হাওয়া থাকে। কারণ স্থানটি উঁচু, প্রশস্ত মাঠ ও সম্মুখে যমুনা। রাজবাড়ী করিতে হইলে এরূপ কেল্লা ও প্রাচীরের ন্যায় স্থান নির্ব্বাচন করাই শ্রেয়ঃ।

রাজবাড়ীর স্থান নির্ব্বাচন

সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে, পুরাতন রাজবাড়ীর যে সব স্থান দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ও রাজবাড়ীর ভগ্নাংশ যেখানে আছে সে স্থানটি হইল নগরের মধ্যে উচ্চস্থান। সন্নিকটে একটি জলাশয় বা নদী, শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি উচ্চ প্রাচীর বা টিলা, স্বাভাবিকভাবে স্থিত বা মানবের পরিশ্রমে নির্ম্মিত থাকা চাই। এই হইল রাজ-বাসস্থান নির্ণয়ের লক্ষণ। কংসের টিলা দেখিলাম, একদিকে যেমন গাড়ী করিয়া উপরে উঠা যায়, অপরদিকে নৌকা দিয়াও আসা যায়; অর্থাৎ দুই প্রকার যানই ব্যবহার করা যায়। স্থানটি যথার্থই মনোরম যদিও এখন ছোট ছোট বাড়ী হইয়া আর তদ্রূপ সুশ্রী নাই।

সাধু মহাপুরুষদের আস্তানা

দ্বিতীয় প্রকার স্থান দেখিলাম যাহা সাধুরা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। সুরম্য, নিভৃত, সুদৃশ্য ও সুবায়ু-প্রবাহিত স্থান সাধুরা নিজেদের আশ্রম করিবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইহা নির্ব্বাচনের দৃষ্টি ও ইচ্ছা এক এক শ্রেণীর লোকের এক এক প্রকার হইয়া থাকে। রাজভবনের জন্য এক প্রকার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং সাধুরা নির্জ্জনে তপস্যা করিবেন বলিয়া তপস্যার অনুকূল স্থান নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। যেখানে সাধুদের আশ্রম হইবে সে স্থানটি অতি সুরম্য ও নির্জ্জন হইবে। লোকালয় হইতে দূরে অথচ আহার্য্য সংগ্রহের জন্য লোকালয়ও বহুদূর হইবে না। এই হইল সাধুদের স্থান।

গৃহীদের আবাস

তৃতীয় হইল গৃহস্থদিগের আবাসভূমি। এই স্থান নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত ও কার্য্যাদির সুবিধা অনুসারে নানাভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈশ্য বা বণিকের স্থান অতি হীন পল্লীতে হইয়া থাকে। কারণ গরীব, দুঃখী ও নিকৃষ্ট শ্রেণীদিগের সহিত ব্যবসা করিলে লাভ অধিক হয়। তাই বৈশ্যশ্রেণী ধনাঢ্য হইলেও অতি নিকৃষ্টস্থানে বিপনী করিয়া থাকে। যেখানে বৈশ্যদিগের বিপনী ও বাসস্থান সেইটাই নিকৃষ্ট ও পূতিগন্ধময় স্থান। এই হইল উত্তর ভারতবর্ষের বাসস্থান নির্ণয়ের সাধারণ লক্ষণ।

কংস-টিলা

ব্রহ্মচারী প্রাণেশ, কানাই ও আমি এই কংসের টিলার উপর যাইতাম। মাঝে একটা প্রাচীর থাকায় সাধারণ লোকে আর অগ্রসর হইত না। আমরা সেই প্রাচীরটা ডিঙ্গাইয়া ঐদিকে যাইতাম। সেইখানে কতকটা প্রশস্ত স্থান আছে। স্থানটি অতি নির্জ্জন, খুব উচ্চ, অবিরাম বায়ু সঞ্চরণে সুস্নিগ্ধ। নিম্নে যমুনা ও সম্মুখে গোকুল। বাম দিকে তাকাইলে বৃন্দাবনের পুরানো গোবিন্দজীর মন্দির দেখা যায় এবং ডানদিকে মুখ ফিরাইলে আগ্রার দিকে চঞ্চল, গতিশীলা যমুনাকে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। এইজন্য এই স্থানটি আমাদের অতি প্রিয় ছিল। এই স্থানটিতে বসিয়া পূর্ব্বকার কথা, অর্থাৎ শ্রীমদ্-ভাগবতে বর্নিত যে সকল কথা আছে তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়ে আর একভাব জাগে। এইস্থলে এককালে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ কংসের হর্ম্ম্য ছিল এবং সামনে নদীর ওপারেই গোকুল। এই গোকুলে নন্দ তাহার বীরপুত্র কৃষ্ণ-বলরাম ও অপরাপর গোপ-দিগকে লইয়া এককালে আসিয়াছিল। সেই কৃষ্ণ-বলরাম কর্ত্তৃক কংস-বধ, চাণূর ও মুষ্টিক নামক দুই মল্লবীরের সহিত তাহাদের যুদ্ধ, কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি যা যা প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে সেই সবই এই স্থানে হইয়াছিল ; এবং অদ্যাপি বর্ত্তুলাকারে সেই টিলা রহিয়াছে, সেই যমুনা প্রবাহিত হইতেছে। খনন করিলে বোধ হয় গৃহাদির, রাজভবনের বনেদ

পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। এই স্থানটি মনোরম লাগিত, ইহার কারণ হইল—সামনে গোকুল, একদিকে বৃন্দাবন ও একদিকে মথুরা নগর, আর সেই প্রাচীন কংসের বাড়ীতে আমরা বসিয়া আছি। এই সকল চিন্তা যুগপৎ মনে আসায় আমাদের প্রাণে অপূর্ব্ব চিন্তাধারা,—আনন্দ, বিষাদ ও নানাপ্রকার সদ্বন্দ্ব চিন্তাস্রোত আসিয়া চিত্তকে প্রমথিত ও আলোড়িত করিত। ইহা স্বাভাবিক এবং সকলেরই অল্পবিস্তর হওয়া সম্ভব।

আমরা এই উচ্চস্থানে বসিয়া যমুনার ওপারে গোকুল দেখিতাম। অনেক বৃক্ষাদি এবং মাঠে ধেনুগণ চরিতেছে, দূরে গ্রামে গ্রামে একটি করিয়া মন্দির আছে। আমাদের কিন্তু ওপারে যাইতে ইচ্ছা হইত না। সেইজন্য কখনও গোকুল গ্রামে যাই নাই। বুঝিলাম, বৃন্দাবনে ও মথুরায় যেরূপ মাহাত্ম্য ও আকর্ষণ, গোকুলের তেমন নয়; কারণ সাধারণ যাত্রীরাও যায় না। একদিন বিকালে আমরা স্থির হইয়া এই টিলাটির উপর বসিয়া আছি ও জপ করিতেছি, এমন সময় কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক-যাত্রীকে গোকুল হইতে নৌকা করিয়া মথুরার দিকে আসিতে দেখা গেল। যমুনার জল কিঞ্চিৎ আলোড়িত হইতে লাগিল, নৌকাখানি দুলিতে লাগিল এবং যদিও উহা দূরে ছিল আমরা কিন্তু উপর হইতে অনেকটা দেখিতে পাইতেছিলাম। যাত্রীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কানাই তখন একটি গান ধরিল :

“হরি! ধীরে তীরে কর পার ;
আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার।

তরী করে টলমল,
পসরাতে উঠে জল,
এবার ডুবিলে তরী কলঙ্ক রটিবে তোমার।"

গানটি এমন স্থানেতে, এমন সময়েতে এবং এমন সংস্রবেতে গাহিয়াছিল যে, পূর্ব্ব ঘটনা যেন চোখের উপর ভাসিতেছিল। গানটি সামান্য হইলেও স্থান-কাল-মাহাত্ম্যে অতি স্মরণীয় হইয়াছিল।

রাজধানীর রাস্তা-নির্ম্মাণ পদ্ধতি

প্রাচীন রাস্তা লম্বা পাথরের টালি দিয়া নির্ম্মিত হইত। সেই টালি,—প্রমাণ এক-মানুষ পরিমাণ লম্বা, চওড়া এক হাত, এবং পুরু অর্দ্ধহাতের উপর। এইরূপ লম্বা পাথরের টালি দিয়া প্রাচীন রাস্তা নির্ম্মিত হইত। উহা চৌকো ছোট টালি নয়,—লম্বা টালি। ইহাকে ইংরাজীতে slab বলে। কাশীরও কয়েক স্থানে আমি এইরূপ দেখিয়াছি। মানিকচকের সন্নিকটস্থ রাণীঘাটের রাস্তা এইরূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত। বোধ হইতেছে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কোন কোন রাজধানীর রাস্তা নির্ম্মাণের প্রথা এইরূপ ছিল।

ঝুলন বা হিন্দোল

মথুরা অঞ্চলে ঝুলন ও দোল এই দুইটি প্রধান উৎসব; দোল হইতে ঝুলন বিস্তৃতভাবের ও সাধারণের পক্ষে আনন্দকর। এই ঝুলন এক মাসের উপর চলে। মথুরা জেলার বাইরে

শ্রীভবেশ বসু বর্ষা বসু

ইহা তত প্রবল ও ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় না যদিও এই সকল অঞ্চলে সব স্থানে অল্পবিস্তর হইয়া থাকে। ইহার কারণ দেখিলাম গ্রীষ্মকালে মাঠ অতিশয় শুখাইয়া যায়, ঘাস কিছুমাত্র থাকে না, অনবরত ধূলি উড়িতে থাকে এবং 'লু' চলায় অনেক সময় গাছ মরিয়া যায়। বড় বড় গাছের গোড়ায় জল দিয়া গাছ বাঁচাইতে হয়। গাছের পাতা সকল বিশীর্ণ, বিবর্ণ ও ধূলায় পরিপূর্ণ। গরমীকালে বিশেষতঃ যখন 'লু' ও 'আঁধি' অর্থাৎ ধূলি ঝঞ্ঝাবাত চলে তখন স্থান ও বৃক্ষাদি যেন বিবর্ণ, বিকট, মলিন ও পাংশুকুণ্ঠিত হয়। তারপর বর্ষা আরম্ভ হইলেই মাঠেতে ঘাস হয়, গাছের পাতার ধূলা ধুইয়া যায়, নূতন সবুজ পাতা গজায়, গাছ সতেজ হয় এবং প্রস্ফুটিত ফুলসম্ভারে সুশোভিত হয়। মাঠের ক্ষেতে শস্য, নদীতে জল এবং গ্রীষ্মের উত্তাপের পারবর্তে বর্ষার জলকণাবাহী স্নিগ্ধ বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত। ধূলির ঝঞ্ঝাবাত উপশমিত হইয়া সুরম্য সুঘ্রাণ ও মধুর বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। মথুরা জেলা সম্বন্ধেই একথা বলা হইতেছে। ঠিক যেন দেখিতে হইল,—মাঠ, ক্ষেত, বৃক্ষাদি, সকলে স্নান করিয়া নূতন হরিৎবর্ণের বসন পরিয়া, পুষ্পরাজী করে লইয়া অদৃশ্য, অলক্ষিত কিন্তু সন্নিকটস্থ ভগবানের মন্দিরে সমবেত হইয়া সকলে পূজা করিতে যাইতেছে। এই রকম দৃশ্য অন্যস্থানে আমার চক্ষে পড়ে নাই। মথুরা জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য, গ্রীষ্মের পর বর্ষা সহসা এত পরিবর্ত্তন করে যে, মানুষের মনেও তাহাতে একটা পরিবর্ত্তন আসে। আকাশ হইতে পর্য্যাপ্ত

বারি বর্ষণ হওয়ায় কৃষিকার্য্যেরও নিশ্চিত সাফল্যের আশা জন্মে এবং গরু ছাগলাদির ও গৃহপালিত পশুর বৎস জন্মিতে থাকে। একদিকে শস্য নিশ্চিত অপরদিকে দুগ্ধও নিশ্চিত; অল্পাহার ও অনাহারের আর ত্রাস রহিল না। এইজন্য ভাদ্রমাসে এই সময়ে স্থানীয় লোক ফসলী বৎসর গণনা করে, অর্থাৎ ফসলের সময় হইতে বর্ষ-নির্ণয় করে। বর্ষ-নির্ণয় দুই প্রকার,—এক রাজ অনুশাসন, আর এক ফসল উৎপাদনের সময়। প্রথম পাওয়া যাইতেছে, অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষ-নির্ণয়; আবার অশোকের সময় হইতে বুদ্ধের জন্মমাস বলিয়া বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ-নির্ণয় হইয়াছিল। এখন ইংরাজ অধিকারে জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষ-নির্ণয় হয়। ইহাকে বলে রাজ-অনুশাসন। কিন্তু ফসলী বর্ষ অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের কাল হইতে নির্ণীত বর্ষ অপরিবর্ত্তনীয়। মথুরা, বৃন্দাবনে ভাদ্রমাসে কোন সময় অর্থাৎ শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষ অনুযায়ী তাহারা বর্ষ-গণনা করে। আমি বাংলাদেশে বাঁকুড়া জেলায় দেখিয়াছি যে, দুর্গা পূজার ষষ্ঠীর দিন চাষীরা ক্ষেতের ধানকে পূজা করিয়া আসে এবং সেইদিন হইতে চাষীদের বৎসর আরম্ভ হয়, অর্থাৎ চাষ আরম্ভের একটা নির্দ্দিষ্ট দিন স্থিরীকৃত আছে। এই ফসলী বৎসর, ভিন্ন জেলায় ভিন্ন দিনে করিয়া থাকে কিন্তু সময়টা দেখিলাম,—যখন ফসলটা ঠিক হইয়াছে, অর্থাৎ ভাদ্রমাস হইতে আশ্বিন মাসের ভিতর।

এই ফসল নিশ্চিত হওয়ায় এবং বায়ু মধুর ও বৃক্ষাদি সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ হওয়ায় স্বভাবতই লোকের মনে একটা

আনন্দের উৎস উঠিয়া থাকে। এইজন্য ঝুলন এই মথুরা অঞ্চলে এত মনোরম।

হরিবংশে উল্লেখ আছে যে, বর্ষা অপগমে রাখাল বালকগণ বৃক্ষশাখায় দড়ির ঝোলা বাঁধিয়া 'হল্লীসক্রীড়া' করিতেছে। এই 'হল্লীস' শব্দটি অপভ্রংশ হইয়া হোলি হইয়াছে। হোলি খেলা শব্দের অর্থ হইল আনন্দ-উৎসব। দুইটি উৎসব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক হইল বসন্ত-উৎসব বা মদনোৎসব। সমস্ত ভারতবর্ষে এবং আর্য্যজাতির বসতি পৃথিবীর যে যে স্থানে আছে, সে সমস্ত স্থানেই এই বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম হইল মদনোৎসব। রোমানরা ইহাকে Feast of Lupercalia বা মাদী নেকড়ে-বাঘের উৎসব বলিত এবং Feast of Saturnalia বা শনি রাশির উৎসব বলিত। আধুনিক য়ুরোপে ইহাকে King carnival এবং Queen carnival বলে। মদনরাজা ও রতিরাণীর উৎসব, এই হইল বসন্ত উৎসবের ব্যাপার। কিন্তু অপরটি ঝুলন বা বর্ষা-উৎসব, কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; এবং বৃন্দাবন ও মথুরা অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা এই উৎসব খুব সমারোহে হইয়া থাকে। যদিও পূজা বা উৎসব পনর দিন নির্দ্ধারিত হয় কিন্তু সাধারণ লোক শ্রাবণ মাস হইতে ভাদ্রের কিছু দিন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। অধিকাংশ লোকই নিজ নিজ ঘরে একটি করিয়া দড়ির ঝোলা বাঁধে এবং সেই ঝোলায় দোল খায় ও রাধাকৃষ্ণের গান গায়। গানের সুর হইল দুলিতে

দুলিতে তাল-মাত্রা রাখা। এইজন্য এই সুরকে হিন্দোল বলে, অর্থাৎ দুলিয়া দুলিয়া সুর। চলতি কথায় ইহাকে 'শাবান' বলে কারণ শ্রাবণ মাসেই এই উৎসব আরম্ভ হয়। একদা আমি কংস-টিলার উপরটিতে বসিয়া আছি ; প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দূরে অপরদিকে লোকালয়। রাত্রি হইয়াছে, ঘরে আলো জ্বালিয়াছে, বেশ দেখা যাইতেছে। একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেই বাড়ীঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলাম গৃহকর্ত্রী উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়াছে এবং রান্না করিবার অবকাশে মাঝে মাঝে একটি দোলায় দুলিতেছে। স্পষ্ট দেখা গেল দুইটি ঝোলা দুলিতেছে, একটিতে স্বয়ং গৃহকর্ত্রী এবং অপরটিতে এক অল্পবয়স্কা কন্যা দুলিতেছে। শ্রাবণমাসে দোলায় দোল খাওয়া এদেশে একটা ভারি আমোদ। পরে জানিলাম যে, সে ঘরগুলি মুসলমানদিগের। কিন্তু দেশের প্রথা সকল স্ত্রীলোকই অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমরা চৌবে পাড়াতেই থাকিতাম, স্থানটি একটা টিলার মত, অর্থাৎ কাহারও বাড়ী তিনতলা কাহারও বাড়ী একতলার সমান। দেখিলাম, সম্মুখের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দুলিতেছে ও রাধাকৃষ্ণের গান করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা মুসলমান। স্থানীয় প্রথার এমন প্রভাব যে, ধর্ম্মান্তর হইলেও স্থানীয় আচার কখনও ত্যাগ করে না। এই মথুরার অনেক মুসলমান হইল জাত-খাওয়া চৌবে ব্রাহ্মণ। যদিও তাহারা বাহ্যিক মুসলমান তথাপি তাহারা, বিশেষ করিয়া তাহাদের মেয়েরা, ঝুলনের সময় দোলনায় দুলিবে ও রাধাকৃষ্ণের

গান গাহিবে। মাঠে রাখাল বালকেরা বড় গাছের ডালেতে দড়ি বাঁধিয়া প্রায় সারাদিনই ঝুলিবে। বৃন্দাবনে নূতন সেবা-শ্রমে আমিও একবার গাছের ডালে পাতকুয়ার দড়ি বাঁধিয়া একটা দোলনা করিয়াছিলাম। সেবাশ্রমের উঠান খুব প্রশস্ত, প্রত্যহ বিকালবেলা বহু লোক এই উঠানে একত্রিত হইয়া থাকে। সমবেত লোকদের যুবা বৃদ্ধ সবাই গাছের ডালে দোলনা বাঁধা দেখিয়া আনন্দের সহিত দুলিতে লাগিল। তাই দেখিয়া আমরা সেবাশ্রমের সব হাততালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতাম। বৃন্দাবনে শ্রাবণ মাসে দোলনায় দোলা একটা বিশেষ আমোদ। পশ্চিম অঞ্চলে অন্যান্য স্থলেও দোলার প্রথা আছে কিন্তু এরূপভাবে নয়। মথুরা জেলার এইটা একটা বিশেষ আমোদ। সকলে যেন একেবারে মাতিয়া ওঠে। ইহাতে আনন্দও বটে আবার ধর্ম্মের ভাবও বটে। ঝুলনের সঙ্গীতাদি সবই প্রায় রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ে রচিত। গানের কথা-গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যেন বর্ণনা হইতেছে, ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে (ঝিমরা ঝিমরা বরিষে বারি), যমুনা ঢেউ খেলিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে, ময়ূর নৃত্য করিতেছে, অন্য পক্ষীসকলও আনন্দে সঙ্গীত করিতেছে; এবং এই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণও যুগল হইয়া কদমতলায় নৃত্য করিতেছেন। এই সময় বৃন্দাবন অঞ্চলে কদম ফুল খুব ফোটে এবং ছোট কদমকে কেলীকদম্ব বলে। যথার্থই সঙ্গীতের এরূপ বর্ণনা যে, তাল-মান দুলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। প্রকৃতির এইরূপ মনোহর দৃশ্যাবলী,

পশুপক্ষীর উল্লাসনৃত্য, বায়ুতে রৌদ্রের প্রখরতা তিরোহিত হইয়া মধুর স্নিগ্ধ হিল্লোল প্রবহমান, এবং ক্ষেতে শস্য নিশ্চিত হওয়ায় আহার্য্যও সঞ্চিত, ইত্যাদি আনন্দকর কারণ সমূহ এক সঙ্গে সন্নিবেশিত হওয়ায় এই সময়টিকে নববর্ষ বা ফসলীবর্ষ বলিয়া এসময়ে সমস্ত দেশময় একটা আনন্দোৎসবের ধুম পড়িয়া যায়। বাংলাদেশে দুর্গোৎসবে যেরূপ আনন্দ, বৃন্দাবন মথুরা অঞ্চলে এই শ্রাবণী ঝুলন উৎসবে সেরূপ আনন্দ হইয়া থাকে। দুর্গাপূজার নবপত্রিকা ঠিক এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সকলপ্রকার নবজাত তৃণ-লতা-গুল্মবৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জের পূজা। ইহা হইল worship of harvest and herbage। এই ঝুলন উৎসবে হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। দেশের প্রথা, জাতির প্রথা বলিয়া সকলেই আনন্দে মাতিয়া ওঠে কিন্তু পুরুষ-দিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই আনন্দ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

রামধারী যাত্রা

এই সময় বৃন্দাবন ও মথুরায় রামধারী যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রাদলের ছেলেরা অবশ্য চাষার ছেলে; কিন্তু তখন তাহারা কৃষ্ণ, বলরাম, গোপকন্যকা সাজিয়াছে। জাতি, বংশ আর কিছুই রহিল না।

আমি বৃন্দাবনে টিকারীর মন্দিরে এই এক প্রথা দেখিয়াছি। ঠাকুর ঘরের সম্মুখে বড় দালানটিতে একটি বড় মঞ্চ নির্ম্মাণ

করিল। এই মঞ্চতে শালু ও রঙ্গীন কাপড় দিয়া বেশ সিংহাসনের মত করিল। কৃষ্ণ, বলরাম, রাধা, গোপকন্যকা ও রাখাল বালকেরা সুন্দর বেশভূষা করিয়া এই মঞ্চের উপর নানাভাবে বসিল। তখন তাহারা প্রকৃত রাধাকৃষ্ণ হইল। ঠাকুরের আরতির পরেই কর্পূরের প্রদীপ ইত্যাদি লইয়া এই জীবন্ত বিগ্রহদের পূজা করিল এবং রাখাল বালকরাও সেই পূজা গ্রহণ করিল। অনেকে সেই সময় ফুলের মালা, লাড্ডু, পেঁড়া লইয়া গিয়াছিল। তাহারা রাধাকৃষ্ণের গলায় ফুলের মালা দিল এবং মিষ্ট-দ্রব্য প্রসাদ করিয়া লইয়া আত্মীয়দের জন্য বাড়ী লইয়া গেল, এবং অনেক বৃদ্ধলোক উহাদের চরণ-ধুলাও লইল। এইরূপ আরতি, ভোগরাগ হওয়ায় মন্দিরের হাওয়াটা যেন একেবারে বদলাইয়া গেল। নাটমন্দির ও উঠানে প্রায় হাজার লোক বসিয়াছিল। সকলের প্রাণে এমন একটা ভাব হইল যেন আসল রাধাকৃষ্ণেরই আবির্ভাব হইয়াছে। নূতন ভাব, নূতন দৃশ্য, নূতন প্রসঙ্গ হইল এবং সকলের মন একেবারেই বদলাইয়া গেল। তারপর রাখালবালকেরা গান গাহিতে ও নাচতে লাগিল। এই বর্ষার সুর আমাদের বাংলাদেশে প্রচলন নাই। নানাভাবে নাচিতে লাগিল ও বাদ্যের সহিত গাহিতে লাগিল। একদিন দেখি প্রত্যেক বালকের হাতে দুইটি করিয়া ছোট ছোট কাঠি। তাহারা পায়ের তালের সঙ্গে হাতের দুইটি কাঠি বাজাইয়া তাল রাখিতেছে। এইরূপ নাচিতে নাচিতে সকলের হাত একত্র হইয়া সব কাঠি একসঙ্গে মিশিল এবং

একটি ফুলের তোড়ার মত দেখিতে হইল। আর একদিন সব রাখালবালক ও গোপকন্যকা নাচিতে নাচিতে সমস্ত হাত এক সঙ্গে করিল; প্রত্যেকের দশটা করিয়া আঙ্গুল একসঙ্গে হওয়ায় যেন একটা ফুলের তোড়া দেখিতে হইল। দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইলাম এবং মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলাম যে, ইহাদের নৃত্যে বিশেষ কৌশল আছে। কখনও কখনও বা উঠানে ঝুলান একটা দোলার নিকট সমস্ত রাখালবালক ও গোপকন্যকারা গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে উপনীত হইল; আমরাও সকলে এই দোলার কাছে গেলাম। সেইদিকে ভাল করিয়া আলো ছিল, যাহারা রাধাকৃষ্ণ সাজিয়াছিল তাহারা দুইজনে দোলায় বসিল এবং রাখালবালক ও সখীরা চারিদিকে ঘিরিয়া গাহিতে ও নাচিতে লাগিল। গানের ধুয়া হইতেছে "বর্ষা ঝুঁকি আই, দোলামে পা ধর", অর্থাৎ বর্ষা জোরে আসিয়াছে, দোলাতে উপবেশন কর। যথার্থই রামধারী যাত্রার দল এমন একটা ভাব আনিয়া দেয় যে, সকলেই বিভোর ও তন্ময় হইয়া উঠে। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আমরা এই যাত্রা দেখিতাম ও তন্ময় হইয়া থাকিতাম। এই গ্রাম্য উৎসব মথুরা অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। অনেক সময় এই রামধারী যাত্রা বৃন্দাবনে যমুনার ধারে বালির মাঠে যে তমালবন আছে তথায় দিনের বেলায় হইত; সেও দেখিতে বড় প্রীতিকর হইত। যাত্রার অধিকারীরা স্থান ও সময় অনুযায়ী পালা বদলাইয়া দেয় ও বেশভূষাও তদনুযায়ী করে। এইজন্য লীলাগান বা পালাগান শুনিতে এত মধুর হয়।

যমুনার জল কূলে কূলে ভরা, কিনারায় প্রশস্ত বালির মাঠ, এদিকে তমালের ঝোপ, যমুনার ওপারে মাঠ, বন এবং ঠিক সেই সময় রাখাল-বালক সব সাজিয়া আসিয়া নানাভাবে নৃত্য ও গান করিতে লাগিল। গানের সুরও খুব সময় উপযোগী, এইজন্য রামধারীর গান এত সুমধুর হয়।

তবে অন্য ঋতুতে এইগান এত মিষ্ট হয় না। বৃন্দাবনে বংশীবটে ও গোয়ালিয়রের মন্দিরে যাত্রাগান নিত্যই হইয়া থাকে; তাহা এত শ্রুতিমধুর হয় না। বৃন্দাবনে বংশীবটে, অর্থাৎ আমাদের সেবাশ্রমের রাস্তার ঠিক ওপারের বাড়ীতে একদিন সকালবেলা যাত্রা আরম্ভ হইল। 'কৃষ্ণোৎসব যাত্রা' পালা হইল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিয়াছেন, মহাদেব দর্শন করিতে আসিয়াছেন। যাত্রার যে ওস্তাদ সে মাথায় জটা দিয়া শিব সাজিয়াছে। এদিকে যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছেন এবং একটি ছোট মেয়ে আগন্তুকের সহিত (মহাদেবের সহিত) কথাবার্ত্তা কহিতেছে। যশোদা নেকড়ার একটি ছেলে কোলে করিয়া ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছেন। পাশে ডানধারে একটি মেয়ে ঘোমটা দিয়া বসিল। যাত্রার যে ওস্তাদ সে মাথায় জটা ও গায়ে বিভূতি মাখিয়া মহাদেব সাজিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "এ মায়ি! তেরা লালাকো দর্শন করনে আয়া।" যশোদা ঘোমটা দেওয়া, অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিবেন না তাই মেয়েটির মারফৎ কথা চলিতে লাগিল। তাঁহার পরামর্শমত জটাধারী ব্যক্তিকে মেয়েটি বলিল, "তেরা গাওমে

সাপ হ্যায়, তেরা ত্রি-নয়ন হ্যায়, তেরা শিরমে জটা হ্যায়, তেরা অঙ্গ্‌মে বিভূতি হ্যায়, তু মেরা লালাকো নজর দেগা, তোম্ চলা যাও।" জটাধারী ব্যক্তি উত্তর করিল, "নেই মায়ি। হাম বহুত দূরসে আয়া, তেরা লালাকো হাম একদফে দর্শন করেগা।" মেয়েটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তেরা নাম ক্যা ?" জটাধারী ব্যক্তি তখন বলিতে লাগিল, "মেরা নাম কাশীজীমে বিশ্বেশ্বর, বৃন্দাবনমে গোপেশ্বর, মথুরামে ভূতেশ্বর।" এইরূপে শিবের নাম একশতের উপর সে আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

এই ছড়া বা নামের মালা এত মধুর ও ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল যে অদ্যাপি আমার বেশ মনে আছে। পালাটা এমন হইয়াছিল যে সকলেই মোহিত হইয়া গিয়াছিল। শেষ গান হইল, "আয়া এক বালা যোগী ইত্যাদি।" বাংলাদেশে যাত্রা-অভিনয় একপ্রকার এবং বৃন্দাবনে যাত্রা-অভিনয় অন্য-প্রকার। দুইপ্রকার অভিনয় ও সঙ্গীতই দেখিবার ও শিখিবার বিষয়। বেশ অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই শ্রেণীর ভাব হৃদয়ে জাগ্রত হয়। এইজন্য আমি ঝুলন ও রামধারীদিগের যাত্রার কথা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। আনন্দ যা অনুভূত হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাষায় শুধু কয়েকটা শব্দ বিন্যস্ত হইয়া মূল বিষয়ের অতি সামান্যই প্রকাশিত হয়; আকার ইঙ্গিতে যেমন কোন বিষয়ের কতকটা বুঝান হয় ঠিক তাই। ভাষাতে কথা প্রাণহীন, আসল প্রাণবন্তভাব সাক্ষাৎ দেখিলেই অনুভব হয়।

বিশ্রাম ঘাট

মথুরায় আর একটি দেখিলাম,—বিশ্রাম ঘাটের আরতি। মানিকচকের নিকটে এই বিশ্রাম ঘাট। এই ঘাটের আরতি বিখ্যাত। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের আরতি হইল প্রথম; বিশ্বেশ্বরের আরতি যে বিখ্যাত ইহা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় আরতি হইতেছে, বিশ্রাম ঘাটের আরতি। এইরূপ গম্ভীর আরতি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের আরতি প্রত্যেক লোক নিজের ব্যক্তিগতভাবে করে—সমষ্টিভাবে নয়, এইজন্য এত গাম্ভীর্য্য নাই। যাহা হউক আমরা প্রায়ই বিকাল-বেলা বিশ্রাম ঘাটে যাইতাম।

বানর বাবাজীর জলপান

ঘাটে সিঁড়ির নীচে জলেতে বড় বড় কচ্ছপ রহিয়াছে; লোকে উপহাসছলে ভীষ্মপিতামহ বলে। আমরা দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় এক ধেড়ে বাঁদর বাবাজীর জলতৃষ্ণা পাইল। সিঁড়ির কাছের জলটা নোংরা। বাঁদর বাবাজী মশাই নিঃশঙ্ক-চিত্তে কচ্ছপদিগের পিঠের উপর দিয়া চলিয়া চলিয়া যেখানে ভাল জল সেখানে গিয়া পান করিল। কচ্ছপের দলে ভ্যাবা-চ্যাকা লাগিয়া গিয়াছে। বানরটি জলপান সমাপ্তির পর পূর্ব্ববৎ কচ্ছপদের পিঠের উপর দিয়া চলিয়া আসিল। তখন কচ্ছপদের খেয়াল হইল এবং মাথা উঠাইয়া এদিকে ওদিক

চাহিতে লাগিল কিন্তু বাঁদর বাবাজী তখন ঘাটে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা তখন হাসিতে লাগিলাম।

আরতি

বিকেলবেলা হইলেই প্রদীপের ডালি ক্রয়বিক্রয়ের ধুম পড়িয়া যায়। নিয়ম হইতেছে, যমুনাকে সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দান করিতে হয়। রেকাবি বা এমন কোন জিনিষের চৌকো ডালি, তাহাতে কিছু ফুল আছে এবং মাটির প্রদীপে একটু ঘি দেওয়া পল্‌তে। পয়সায় দুখানা ডালি। আমরা প্রত্যেকেই দু'তিন পয়সা করিয়া ডালি কিনিলাম। ডালিওয়ালা প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আমরা যমুনাকে প্রণাম করিয়া ও জলস্পর্শ করিয়া যমুনার আরতির উদ্দেশ্যে সেই প্রদীপগুলি যমুনার জলে একবার স্পর্শ করাইলাম। তারপর বড় বড় ভীষ্মপিতামহ-কচ্ছপের পিঠে সেই ডালিগুলি রাখিয়া দিলাম। কচ্ছপরা ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল ও ডালিশুদ্ধ প্রদীপ তাহাদের সঙ্গে যমুনার দিকে যাইতে লাগিল। আমরা তীরে দাঁড়াইয়া হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিলাম। চলন্ত প্রদীপমালা জলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তারপর সন্ধ্যা হইল। ঘাটের উপর গোটাকতক মঞ্চ আছে, উঁচু এবং খিলানের মত কড়িকাঠ লাগান, তাইতে বড় বড় গোটাকতক ঘণ্টা ঝুলান। ঘণ্টার ডাঁটিটা একটা লোহার গুল এবং গুল-এর সঙ্গে লম্বা তার বাঁধা আছে। যেখানে আরতি

হয় সেই উঠানটাতে চারি পাঁচশত লোক ধরে এবং তিন দিকে মন্দির ও রক। সন্ধ্যা হইতেই আরতি আরম্ভ হইল। একটা পিতলের শতদল প্রদীপ অর্থাৎ পিতলের একটা বড় ডাণ্ডা তাহাতে পাঁচ ছয় স্তবক ছোট ছোট প্রদীপ (ঝাড় প্রদীপ), ওজন কয়েক সের হইবে। পূজারী সেই শতদল প্রদীপটিকে দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া যমুনাকে প্রদীপের আরতি করিতে লাগিল এবং কয়েকজন লোক সেই ঘণ্টাগুলির লম্বা তার হাতে ধরিয়া তাল-মান ঠিক রাখিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। এদিকে রাত্রি হইল, সম্মুখে প্রশস্ত যমুনা, ভাবটা অতি গম্ভীর হইয়া উঠিল। অনেক যাত্রী উঠানে আসিবার পথে ও রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল, ভিতরে আসিবার স্থান নাই। প্রদীপের আরতি নানাপ্রকার ও নানাভাবের হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ আরতি হইতে লাগিল এবং বারটা ঘণ্টার শব্দ একসঙ্গে হইতে লাগিল। কাশীর বিশ্বেশ্বরের আরতিতে যেমন রৌদ্রীয় স্তব পাঠ হয়, বিশ্রামঘাটের আরতিতে এমন স্তবপাঠ শুনিলাম না; কিন্তু আরতি ও ঘণ্টার বাদ্য এমন গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং দর্শকগণ এমন আগ্রহে ভক্তিপূর্ণভাবে দেখিতে লাগিল যেন একটা নূতন ভাব, একটা নূতন শক্তি সকলের ভিতর আসিল। সকলেই তন্ময় ও একাগ্রচিত্ত হইয়া দেখিতে লাগিল। এইজন্য বলিতেছি যে, বিশ্বেশ্বরের আরতির পর বিশ্রামঘাটের আরতি অতি মনোরম; একটা নূতন ভাব, নূতন শক্তি আনিয়া দেয়। এই সকল বিশেষ কিছু বর্ণনা করিবার নয় কিন্তু দেখিবার ও

উপলব্ধি করিবার বিষয়। এটা হইল ধ্যানের কথা, ভাষার কথা নয়।

দ্বারকাজীর মন্দির ও প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য

মানিকচকে প্রধান মন্দির হইল দ্বারকাজীর মন্দির। আমরা ঠিক এই মন্দিরের পিছনদিকে দু'একখানা বাড়ীর পাশেই থাকিতাম। অনেক সময় সদর দোর দিয়া না যাইয়া গলির ভিতর দিয়া আসিয়া পিছনদিকের দরজা দিয়া যাইতাম। সকলে চিনিত এইজন্য কিছু আপত্তি করিত না। দ্বারকাজীর মন্দিরের স্থাপত্য-বিষয় প্রাচীন হিন্দু-প্রথা অনুযায়ী। মন্দিরটি ঠিক হিন্দু-স্থাপত্যের নিয়ম অনুযায়ী উঠানো,—মধ্যস্থলে মন্দির, গর্ভগৃহ, নাটমন্দির ইত্যাদি। বিশেষতঃ এই মন্দিরের স্তম্ভগুলি চতুস্ফলক বা যট্‌ফলক। বৃন্দাবনে পুরাতন জয়পুর-মন্দিরের কোন কোন ভগ্নাংশে এই প্রকার স্তম্ভ দেখিয়াছি। খিলান ঠিক প্রাচীন হিন্দু নিয়ম অনুযায়ী। কুসুম-সরোবর ও ভরত-পুরে যে সব মন্দির আছে তাহা অনেকটা আধুনিক প্রথা অনুযায়ী, অর্থাৎ মোগল প্রভাবের পরবর্ত্তীকালের। বৌদ্ধ-মন্দির ও স্তম্ভ অনেকটা বিভিন্ন প্রকারের হয়। উপরোক্ত সাধারণ স্তম্ভ ও খিলান আধুনিক কালের ন্যায় হইয়াছে ও অনেকটা মিশ্রভাব দেখা যাইতেছে। কিন্তু দ্বারকাজীর মন্দিরের স্তম্ভগুলি প্রাচীন হিন্দুভাবে নির্ম্মিত এবং খিলানও তদ্রূপ। এইজন্য ইহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। মন্দিরে গেলে বিশেষ

একটি গমগমেভাব আসিত এবং জপ-ধ্যান করিতেও বেশ সুবিধা হইত। বাড়ীর পাশে মন্দির, এই জন্য সকাল-বিকাল সব সময়েই যাইতাম। যাহা হউক এই মন্দিরটিতে বসিলে বেশ একটা জপধ্যানের ভাব আসে এবং অনেকেই এইস্থানে আসিয়া জপ ধ্যান করিত। অন্য বিষয় সাধারণ মন্দিরের ন্যায়।

ধ্রুব-টিলা

মথুরা নগরের অপর প্রান্তে ধ্রুবঘাট আছে। এই ঘাটে অদ্যাপি পূজা তর্পণ করিতে হয় এবং নিকটে অনেকগুলি পুরাতন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জনসমাগম আর তদ্রূপ নাই। যমুনার জল সরিয়া গিয়াছে, কিনারার জলে বড় কাদা। ধোপারা এই স্থানে কাপড় কাচিয়া থাকে। যাহা হউক, ধ্রুবঘাটে এখনও একটা পূজাতর্পণ করার প্রথা আছে। এই ঘাটের উপরে ধ্রুব-টিলা একটি উঁচু ঢিপি বা ক্ষুদ্র পাহাড়, তাহার উপরে ধ্রুবের মন্দির। শ্বেত প্রস্তরের ধ্যানমূর্ত্তি বিগ্রহ। মন্দিরটি পুরাতন, কোন সংস্কার হয় নাই, জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, এবং সম্মুখে ঘরকতক পাণ্ডাদের বাড়ী রহিয়াছে। পাণ্ডাদের পুরুষরা অন্যান্য জায়গায় যজমানি করিতে চলিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা কোন যাত্রী গেলে মন্দির পরিদর্শন করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ স্ত্রী-পাণ্ডা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রমে (Lawrance Gunje) সেখানেও স্ত্রীলোক পাণ্ডাগণই কাজ করিয়া থাকেন। এই পাণ্ডারা অতিশয় গরীব,

৬

কিন্তু দেখিলাম যদি কোন সাধু বা ভিখারী এই গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে উপনীত হয় তাহা হইলে এই গরীব পাণ্ডা-স্ত্রীগণ অক্ষুন্ন মনে একটি রুটি, একটু ডাল দিয়া থাকেন। এইটুকু দেখিলাম এই পাণ্ডা স্ত্রীলোকদিগের মহত্ত্ব। গরীব হইলেও ব্রাহ্মণের যাহা রীতি-নীতি ও কর্ত্তব্য সব পালন করেন। প্রথম দিন যখন আমরা যাই, তখন পাণ্ডা-স্ত্রীগণ উনুন হইতে চাটু নামাইয়া আমাদের মন্দির দর্শন করাইলেন। প্রথম আমরা এতটা বুঝিতে পারি নাই। পরে, তাহাদের কষ্টে দিন যাপনের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখ অনুভূত হইয়াছিল। আমি কখনও একা কখনও বা কানাইকে লইয়া নির্জ্জন ধ্রুব-টিলার উপর চলিয়া যাইতাম। স্থানটি উঁচু উঁচু ঢিপিতে পরিপূর্ণ। চারিদিকে গাছপালা এবং নীচে যমুনা। এই স্থান হইতে অনেক বিস্তৃত-ভূমি দেখা যায়, এবং কাছে অনেক টিলা, গাছ, জঙ্গল আছে তাহা বেশ দেখা যায়। মথুরার প্রাচীন নাম হইল মধুবন। বোধ হয় প্রাচীনকালে এখানে অনেক বৃক্ষাদি ছিল এবং হরিবংশে অনেক টিলা বা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবাদ হইতেছে যে, ধ্রুব এইস্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু পুরাণ অনুযায়ী এই কথা স্মরণ হওয়ায় আমাদের বেশ একটা আনন্দ আসিত। এইখানে দু'চারজন সাধুও বাস করেন। এই স্থান এত নির্জ্জন, সুরম্য ও সুবায়ুযুক্ত যে, ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা করে না। এইজন্য আমি অনেক সময় সকালে বা বিকালে এই

স্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিতাম এবং অনেক সময় কানাইও থাকিত।

কাশীর চারু (শুভানন্দ স্বামী) কানাই ও আমি একদিন সকালে গেলাম। ঐখানকার কয়েকটি সাধু দিনকয়েক থাকিবার জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুনয় করিল। চারুর খুব ইচ্ছা যে, তিন-চার দিন ঐখানে বাস করে। কানাই-এরও খুব ইচ্ছা ছিল। আমি বলিলাম যে, এখন একজনের বাড়ীতে রহিয়াছি তাহাকে না বলিয়া অন্যত্র থাকা উচিত নয়। এই সকল বলিয়া সকলকে ফিরাইয়া আনিলাম। সে যাহা হউক, স্থানটি এত সুন্দর, ধ্রুবের স্মৃতি এমন মধুর যে স্থানটিতে থাকিতে আপনা হইতেই মন আকৃষ্ট হয়। এই স্থানটিকে আমি শতবার প্রণাম করি এবং স্থানের অন্তর্নিহিত যে শক্তি আছে তাহাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি ও তাহার আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করি। এইস্থানের অন্তর্নিহিত শক্তি যেন সকলেরই মঙ্গল করে। স্থানটি আমার অতি মধুর লাগিত। যথার্থই ইহা একটি তীর্থক্ষেত্র।

চাণূর ও মুষ্টিক

মথুরায় কুস্তি লড়ার অতিশয় প্রচলন এবং অনেক কুস্তির পালোয়ান এখানে আছে। একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, কুস্তির আখড়ায় মহাবীর বা হনুমানের মূর্ত্তি থাকে; ইহা সাধারণ প্রথা। কিন্তু মথুরার অনেক স্থানে দেখিলাম, চাণূর ও মুষ্টিকের

প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; দেওয়ালে চাণুর ও মুষ্টিক লড়িতেছে—এই প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, কিন্তু মহাবীরের মূর্ত্তি নাই। লোকেরা বলিল কংসের দুই মল্ল ছিল, তাহাদের নাম চাণূর ও মুষ্টিক। তাহারা কুস্তির পঁ্যাচ নানা প্রকার উদ্ভাবন করিয়াছিল এইজন্য ইহাদের প্রণাম করিয়া লইতে হয়। যাহারা কুস্তি লড়ে তাহারা ভাল বলিতে পারে, আমি দেখিয়াছিলাম সেইজন্য মাত্র উল্লেখ করিলাম।

কংস-কারা

কংসের কারাগার বলিয়া একটি প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা দেখায়। এখন সেই বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া মধ্য দিয়া রেল চলিয়া গিয়াছে এবং একস্থানে একটি মসজিদ রহিয়াছে, কিন্তু সেই মসজিদে মুসলমান যাত্রী বড় যায় না। হিন্দু যাত্রীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া কখনও কখনও প্রণাম করিয়া আসে। কারণ, এই পাড়ায় হিন্দুর বাস; মুসলমানের বাস নাই। বাড়ীটি পুরাতন, কিন্তু ব্যাপার কি, ঠিক বলিতে পারা যায় না।

মথুরার ভূগর্ভস্থ ভগ্নাবশেষ

দূরে আর একটি বাড়ী দেখিলাম—সেইটি তখন খনন করা হইতেছে। বাড়ীটি অতি প্রশস্ত এবং মাটির নীচে চলিয়া গিয়াছে। পাশে একটি খাল বা নদীর জলের প্রবাহের একটি চিহ্ন রহিয়াছে। এককালে যে সেটা পয়ঃপ্রণালী ছিল তাহা বেশ

বুঝা যায়; কারণ, শুকনা বালি রহিয়াছে। কানাই অল্পবয়স্ক ও চট্‌পটে ছিল। সে আমার নিষেধ না মানিয়া যেখানে মাটী খনন হইতেছিল তাহার ভিতর চলিয়া গেল এবং সমস্ত দেখিতে লাগিল। আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া আমরা দুইজনে দেখিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে আমরা যাইয়া এই স্থান দেখিতাম ও চিন্তা করিতাম। কাহারও কাহারও মত যে, এই বাড়ীটি কোন সময়ে দুর্গ ছিল এবং মথুরা রক্ষার জন্য এইস্থানে রাজবাড়ী বা দুর্গ নির্ম্মাণ হইয়াছিল। কিন্তু এইস্থলে আমার নিজের মত বলিতেছি। আমি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, আমার তাহাতে ধারণা হইল যে, প্রাচীনকালে এই স্থানটিতে বিস্তীর্ণ বৌদ্ধবিহার ছিল। কারণ বৌদ্ধদিগের এই শয়ন-গুম্ফা (Dormitory) দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং সঙ্ঘারাম (Auditorium), এই রকম আয়তনের ভগ্নগৃহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; এবং পাঠাগার, পুস্তকাগার এই সকল আয়তনের ভগ্ন প্রাচীর, তাহাও লক্ষিত হইতেছে। স্থানটি হইল নগরের এক প্রান্তে এবং নিকটে কোন জলাশয় বা পয়ঃ-প্রণালী প্রবাহিত হইত। এই জন্য আমার এই অনুমান যে, স্থানটি কোন সময়ে বৌদ্ধবিহার ছিল। হিউনশাঙের বইয়েতে আছে যে, মথুরা নগর বৌদ্ধদিগের একটা বিশেষ কেন্দ্র ছিল এবং বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায় এই স্থান হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কয়েক সহস্র বৌদ্ধশ্রমণ এখানে বাস করিতেন এবং টিলার ভিতর মৃত্তিকার গুহা করিয়া অনেকে থাকিতেন। আমি

বৃন্দাবনে ভাতৌড়ি বা অক্রূরঘাটের কাছে কয়েকটি মাটীর গুহা দেখিয়াছি। সংখ্যায় পাঁচ-সাতটি হইবে। সম্ভবতঃ অপর গুহাগুলি যমুনায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর একটি দেখিলাম,—মশানের নিকট হইতে একটি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে 'বাসুদেব-সম্প্রদায়ের' উল্লেখ রহিয়াছে। হিউনশাঙের বইয়েতে এই সম্প্রদায়কে বিধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। ঐ বইতে হরিদ্বারের বর্ণনাকালে শিবের উপাসক বা শৈবসম্প্রদায়কেও বিধর্ম্মী বলিতেছে।

এই সকল কারণে বেশ বুঝা যায় যে, মথুরা একটি বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। সম্ভবতঃ ইহা 'সর্ব্বেষ্টিবাদি'দের এক বিশেষ কেন্দ্র। এই সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ ছিল। যাহা হউক, খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও বাসুদেব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-প্রয়াস এই মথুরাতে হইয়াছিল। এই মথুরা অতি প্রাচীন নগরী। এই নগরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ প্রাচীনকালে ইহা পণ্ডিতদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। আর একটি কথা,—'কর্পূর মঞ্জরী' কাব্য শূরসেনীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে। মথুরা প্রদেশ হইল শূরসেনীয় বংশের রাজধানী, এইজন্য কৃষ্ণকে শৌরি বলে। যাহা হউক, এই মথুরার বিষয় গবেষণা করিবার অনেক কিছু আছে এবং ভবিষ্যতে এই স্থানটি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপাদান প্রদান করিবে।

পুরাতত্ত্বাগার

মথুরায় একটি পুরাতত্ত্ব-আগার আছে। যদিও এখন সংগৃহীত বস্তু সামান্য তবু বিশেষ কয়েকটির কথা উল্লেখ করিতেছি। বৌদ্ধদের প্রস্তর নির্ম্মিত রেলিং বা বিভাগবেড়া, ইংরাজীতে যাহাকে pew বলে তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন পল্লী অক্ষরের প্রস্তরফলকও রহিয়াছে। প্রাচীনকালে দেখা যাইতেছে যে, নাগরিক অক্ষর ও ভাষা এবং পল্লী অক্ষর ও ভাষা উভয়ই প্রচলিত ছিল। নাগরী অক্ষর ও ভাবা হইতে সংস্কৃতভাবা চলিল অর্থাৎ নগর-বাসীদের ভাবা, এবং পল্লীঅক্ষর ও ভাষা হইতে পালি ভাষার প্রচলন হইল। এই দুই ভাষা ও অক্ষরে নানা তারতম্য ও প্রভেদ আছে। এখানে সামান্য আভাস দেওয়া হইল মাত্র।

সেই পুরাতত্ত্ব-আগারে একটি মৃত্তিকার অনুকরণপেটী দেখিলাম। 'আটক' বা তৎপ্রদেশে বুদ্ধের অস্থি যেভাবে পাওয়া গিয়াছিল ঠিক তাহার অনুকরণ করিয়া একটি মৃত্তিকার পেটিকা বা কৌটা সংরক্ষিত হইয়াছে। বিশেষ একটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই যে, সম্রাট কনিষ্কের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি এইস্থানে পাওয়া গিয়াছে। একটি হাতলওয়ালা চেয়ার, সেটি যেন সিংহাসন। পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত বুটজুতা। পায়ের আঙ্গুলের দিকের স্থানটা চৌকো অর্থাৎ ক্ষীণভাবের নহে, প্রশস্তভাবের এবং লম্বা জামা পরা। মূর্ত্তির নিম্নস্থানে প্রাচীন অক্ষরে লেখা

কিন্তু মূর্ত্তিটির শিরোভাগ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। আমি এই প্রাচীন-তত্ত্বাগার দর্শনের পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় যত পুস্তকাদি ঐ স্থানে পাওয়া গিয়াছিল তাহা পড়িয়া লইয়াছিলাম। এইজন্য বলিতেছি, এই প্রাচীন তত্ত্বাগারটি ক্ষুদ্র হইলেও উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ এই স্থানটি আগে বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল, কারণ অনেক বৌদ্ধ চিহ্ন ও প্রস্তরফলক পাওয়া যাইতেছে। আমি মিউজিয়মের অধ্যক্ষের সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিলাম। যেখানে সেখানে অনির্দ্দিষ্টভাবে খনন না করিয়া যদি নগরপ্রাচীরস্থান নির্ণয় করা যায়, তবে অপর সকল স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। হরি-বংশে মথুরার প্রাচীরের কথা বিশেব করিয়া উল্লেখ আছে। প্রাচীরের বনিয়াদ বা নিম্নস্তর নিশ্চয় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। যদি সেই স্থানটা নির্ণয় করা যায়, তবে হরিবংশ বা ভাগবতের বর্ণনা অনুযায়ী নগরের অনেক রাস্তা, গৃহাদি আংশিকভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে; কারণ নগরপ্রাচীর-ভিত কখনও নষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রন্থে রাস্তার নাম উল্লেখও আছে। এই বিষয়ে হিউনশাঙের গ্রন্থ অনেক সাহায্য করিবে। আমার ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছিল যে, কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া খননকার্য্য সুরু করিবার কথা পর্য্যন্ত পরস্পর হইয়াছিল। কিন্তু অনেক টাকার প্রয়োজন বলিয়া এই প্রয়াস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, মথুরা প্রাচীন ভারতের এক প্রধান কেন্দ্র। তথাকার ভূগর্ভস্থ সম্পদ উদ্ধার হইলে প্রাচীন ভারতের বহু তথ্য আবিষ্কারের উপাদান নিশ্চিত পাওয়া যাইবে। অদূর ভবিষ্যতে

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে এই আশা আমি দৃঢ়তার সহিত পোষণ করি।

পাতালভবন

আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, মথুরার শেষ প্রান্তে মাঠের দিকে একটি পাতালভবন আছে। ইহা জয়পুর মহারাজের বাড়ী। আমি কয়েকবার এইস্থানে গিয়াছিলাম; তাহার বর্ণনা দিতেছি। একটি বিস্তীর্ণ মাঠকে খনন করিয়া প্রশস্ত পুকুর করা হইয়াছে। পুকুরের ভিতর হইতে সাততলা বাড়ী উঠিয়া উপরকার মাঠের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। একদিকে হাতি নামাইবার ঘাট, ঘোড়া নামাইবার ও মানুষ নামিবার ঘাটও আছে। অন্যদিকে অন্যপ্রকার ইমারতও আছে। পুকুরের জল যেমন উঁচুতে উঠিবে, সর্ব্বনিম্নতল হইতে মানুষ আরও উপরে উঠিবে। এইরূপে সাততলা পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন পুকুরের জল শুখাইয়া গিয়াছে। মধ্যে কোন স্থানে সামান্য একটু জল আছে, তা ছাড়া সব বালিতে পরিপূর্ণ। বাড়ীখানি খিলানের উপর তৈয়ারী,—কাড় বরগা কিছু নাই। পুকুরের জল শুখাইয়া যাওয়ায় এখানে সাধুরা আর বাস করে না। বাড়ীখানির নির্ম্মাণপ্রথা হইল একটি করিয়া খিলানের উপর ঘর। এইরূপ ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটি লম্বা দালান এবং প্রত্যেক ঘরের সম্মুখেই দুইটী স্তম্ভ ও একটি খিলান।

বায়ু ও রৌদ্র ঘরের ভিতর যাইতে পারে। ইহা তপস্বীদের সাধন-ভজনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু পুকুরে জল না থাকায় এবং সন্নিকটে বসতি না থাকায়, এই স্থানটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই গৃহের নিকটে মাঠের উপর জনকয়েক সাধু বাস করেন। তাঁহারা অতি যত্ন করিয়া দেখাইবার জন্য আমার সঙ্গে চলিলেন। মাঠের সমতল হইতে কিছু নামিলেই সর্ব্ব উপরকার তলা পাওয়া যায়, অর্থাৎ নীচু হইতে সপ্তম তলা। আমি সেই প্রথম তলাতে ঢুকিয়া দেখিলাম যে, খালি ঘর অসংখ্য রহিয়াছে এবং খালি লম্বা টানা দালান। বারান্দা হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম যে, নিম্নে পুকুরের মধ্যে বাড়ী : বেলা ১১টার সময় আমি গিয়াছিলাম। এক প্রকাণ্ড বাড়ী, জন-মানব কেহ নাই, ধুলা ও মাকড়সার জাল। ঠিক যেন একটা রাক্ষস আসিয়া রাজবাড়ীর সমস্ত লোককে খাইয়া ফেলিয়াছে, এবং বাড়ীর খিলানগুলি চক্ষের কোটর ও কঙ্কালের ন্যায় রহিয়াছে। বাড়ীখানা যেন মুখ হাঁ করিয়া মানুষকে খাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গের সাধুটি কতকদূর আসিয়া চলিয়া গেল। আমি একাকী সেই বাড়ীর মধ্যে রহিলাম। আমি খানিকটা থাকিয়াই পলাইয়া আসিলাম। আমি এমন ভীষণ বাড়ী আর দেখি নাই। কিন্তু ইহা একটি স্থাপত্য-শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন। ইহাকে লোকে বলে রাক্ষুসে বাড়ী। বিশেষ একটি বক্তব্য যে, স্থাপত্যশিল্প দেখিবার বৃন্দাবন ও মথুরা একটি প্রধান স্থান। মোগল বাদশারা দিল্লী,

আগ্রাতে নিজেদের ভাব অনুযায়ী অনেক স্থাপত্যশিল্প দেখাইয়াছেন, কিন্তু হিন্দু রাজারা নিজভাব অনুযায়ী এই মথুরা বৃন্দাবনে স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন রাখিয়াছেন। এই রকম বিবিধ স্থাপত্যের একত্র সমাবেশ আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। বহুপ্রকার হিন্দুস্থাপত্য এই অঞ্চলেই দেখা যায়। স্থাপত্য বিষয়ে মনে যতপ্রকার ভাবের উদয় হয়, এবং বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিবার যে সব উপাদান অবলম্বন করিতে হয়, সেই সকল অনেক বিষয়ের নিদর্শন এই প্রাচীন মথুরায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্য এই স্থানটি ভক্ত, জ্ঞানী, ঐতিহাসিক, পুরাতত্ত্ববিদ্ ও বহুশ্রেণীর লোকের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপাদান সংরক্ষণ করিতেছে। নানা প্রকার লোক নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী এই স্থানটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অশেষ আনন্দ পাইতে পারেন। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্য, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ের অনেক নিদর্শন এই স্থানে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে।

সনাতনের স্থান

বৃন্দাবনের শেষ প্রান্তে সনাতন মহাপ্রভুর সমাধিস্থান আছে। ঠিক নগরটি শেষ হইল এবং প্রশস্ত মাঠ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে সন্নিকটে যমুনা প্রবাহিত হইত কিন্তু এখন চড়া পড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। এইজন্য এই স্থানটি খাদর বা চড়া-জমি বলে। সনাতন মহাপ্রভুই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বৃন্দাবন স্থাপন

করিয়াছিলেন। আমি মাঝে মাঝে এই স্থানটিতে যাইয়া বসিয়া থাকিতাম। অতি নিরিবিলি ও সুরম্য স্থান। গুটিকতক খেজুর গাছ আছে, দেখিলে বোধ হয় যেন সহসা বাংলাদেশে আসিলাম। ঠিক বাংলা দেশের মত ভাব। সমাধির এক পার্শ্বে কতকগুলি 'সমাজ' বা অল্প আয়তনের স্তম্ভ আছে। শুনা যায়, চৌষট্টি গোস্বামীর অস্থি এই পুণ্যভূমিতে সমাহিত আছে। কিন্তু সংখ্যায় ষোল বা কুড়িটি হইবে, চৌষট্টি বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, এই স্থানটি সনাতন মহাপ্রভুর বাসভূমি বা সমাধির স্থান হওয়ায় অতি পবিত্র স্মৃতি জড়িত।

এইজন্য মাঝে মাঝে আমি এই স্থানটিকে প্রণাম করিতে যাইতাম এবং প্রত্যেক দর্শকেরই এই স্থানটিকে প্রণাম করা আবশ্যক, কারণ ইনি বাংলার গৌরব স্বরূপ। বর্ত্তমান বৃন্দাবন-ক্ষেত্র ইনিই স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই জন্যই সেখানে বাঙালীর সর্ব্বেব প্রাধান্য।

অদ্বৈত মঠ

এই স্থানের অতি নিকটে অষ্টসখির মন্দির আছে। অষ্টসখির মন্দিরের অনতিদূরেই অদ্বৈত-মঠ বলিয়া একটি স্থান। প্রবাদ আছে যে, অদ্বৈত-মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন গিয়াছিলেন তখন এই বটগাছটির তলায় কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। এই অদ্বৈত মঠের অপর পার্শ্বে জীব গোস্বামীর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের ('চৈতন্য চরিতামৃত'—লেখক) সমাধি আছে। এই

সকল হইল স্থানীয় প্রবাদ, ঐতিহাসিক বিষয়ে কোন কিছু নির্ণয় করা যায় না। যাহা হউক, স্থানটির সহিত অতি পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত থাকায় আমি মাঝে মাঝে যাইয়া প্রণাম করিয়া আসিতাম। প্রত্যেক যাত্রীরই বৃন্দাবন গেলে এই সকল স্থান দর্শন ও প্রণাম করা উচিত।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজী

বরাহ ঘাটের সন্নিকটে একটি বাঙালী বৈষ্ণব সাধু থাকিতেন। তাঁহার নামটি এখন আমি ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না; সম্ভবতঃ চরণ দাস বাবাজী হইবে। ইনি অতি উন্নত অবস্থার ও উদার ভাবের লোক ছিলেন। বয়স প্রায় ১২০ হইয়াছিল। আমি রাস্তার ধারে অশ্বত্থ গাছের তলায় তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিয়া আসিতাম। এইরূপ সর্ব্বদাই করিতাম। কিন্তু একদিন পরিক্রমাকালে সকালে ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার সন্নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসি। তাঁহার অনেকগুলি বাঙালী বৈষ্ণব শিষ্য ছিল।

আমি স্থানটিতে প্রবেশ করিলে তাহারা বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া বাবাজীর সন্নিকটে আমাকে লইয়া গেল। শীতকাল,—বেলা ৯টা হইয়া গিয়াছে, রৌদ্র বেশ উঠিয়াছে, আমি মেঝেতে যাইয়া বসিলাম এবং ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম

করিলাম। ইঁহার বয়স অধিক হইয়াছিল এইজন্য শীত সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একখানা কাঁথা মুড়ি দিয়া মেঝেতে শুইয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "আমি কোন কষ্ট দিতে আসি নাই, কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রণাম করিতে আসিয়াছি।" তিনি কাঁথার ভিতর হইতে দুই চারিটি কথা বলিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেখিলাম তাহাতে তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। আমি দু'তিন মিনিটের ভিতর পুনরায় তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ-প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্যদের সহিত বাহিরে আসিলাম। শিষ্যরা আমাকে ঐ স্থানে আহার করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি বিনীতভাবে বলিলাম যে, "আমরা সেবাশ্রমের লোক, আমাদের আহারের বন্দোবস্ত আছে, অনর্থক কষ্ট দিতে আসি নাই।" এইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। এই মহাপুরুষ সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ভাব অতি উদার, সাম্প্রদায়িকতা কিছুমাত্র ছিল না। সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় যেরূপ বৈষ্ণবদিগের উপাখ্যান পাওয়া যায়, ইনি ঠিক তদ্রূপই ছিলেন। তাঁহার দেহ-ত্যাগ হইলে বহু-সংখ্যক লোক তাঁহার শবদেহ লইয়া যমুনায় জলসমাধি দিয়াছিল। এই মহাপুরুষকে আমি যেমন বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম তেমন বৃন্দাবনের সকল নরনারীই করিতেন।

বিল্বমঙ্গলের স্থান

গোবিন্দজীর বাজারে একটি বাড়ীতে বিল্বমঙ্গলের সমাধি আছে বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। আমি ঐতিহাসিক হিসাবে কিছু বলিতে পারি না; কিন্তু প্রবাদ অনুযায়ী আমি মাঝে মাঝে গিয়া স্থানটিকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। আমি উদ্দেশ্যে এই মহাপুরুষকে প্রণাম করিতাম, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল, তর্ক-যুক্তির কোন আবশ্যক নাই।

বাবা হরিদাসের স্থান

পানিঘাটে এখন যেখানে আমাদের সেবাশ্রম হইয়াছে সেই রাস্তায় ঢুকিতে, যমুনার তীরে বাবা হরিদাসের স্থান। ইনি হইলেন তানসেনের গুরু। প্রবাদ হইতেছে, তানসেন ব্রাহ্মণ ছিলেন। কানপুরে তাঁহার জন্মস্থান, পূর্ব্বনাম ছিল তন্নাম মিশ্র, এবং তাঁহার এক ভ্রাতা মহাভারত খুব সুললিত ভাবে পড়িতে পারিতেন। যাহা হউক, তানসেনের বিষয় অনেক কিংবদন্তি আছে তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। বাবা হরিদাসের স্থানটিতে একটি মালতী ফুলের কুঞ্জ আছে। সমাধিগৃহে একটি বড় তানপুরা আছে এবং চাতাল বা উঠানটিতে যমুনার বালি ঢালিয়া রাখিয়াছে। স্থানটি অতি সুরম্য ও নিরিবিলি। কোন প্রকার কোলাহল বা চাঞ্চল্যভাব নাই। স্থানটি সেবাশ্রমের অদূরে হওয়ায় আমি মাঝে মাঝে অপরাহ্নে এই স্থানটিতে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম; স্থানটি অতি স্নিগ্ধকর। রাধাষ্টমীর

সময়ে তিনদিন ব্যাপী এইস্থানে উৎসব হয় এবং নানাস্থানের গায়ক আসিয়া আদিগুরুর স্থান বলিয়া ভজন গাহিয়া থাকেন। শুনিলাম যে, পূর্ব্বে নানাদেশীয় বিশিষ্ট গায়ক এই স্থানটিকে সম্মান দেখাইবার জন্য সমাগত হইয়া সঙ্গীত করিতেন। কিন্তু আমি যে কয়বার দেখিয়াছি,—সাধু অথচ গায়ক এমন ব্যক্তিরাই আসিয়া ভজন-গান করেন। অপর কথা, ধ্রুপদীদের সেরূপ আসিতে দেখিলাম না। যাহা হউক, ধ্রুপদীদিগের আদিগুরুর স্থান বলিয়া এই কুঞ্জটি অতি বিখ্যাত এবং অতি নিরিবিলি ও সুরম্য হওয়ায় আমি মাঝে মাঝে এই স্থানটিতে যাইয়া বসিয়া থাকিতাম।

ব্রহ্মকুণ্ড

বৃন্দাবনের স্টেশনের পূর্ব্বদিকে একটি মাঠ পার হইলে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটি স্থান পাওয়া যায়। এটি হইল একটি প্রশস্ত গজগিরি পুকুর, আর তাহার চারিধার বাঁধান। পুকুরের একদিকে হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবরা থাকেন এবং অপর দিকে বাঙালী বৈষ্ণবরা থাকেন। এইখানকার বাঙালী বৈষ্ণবরা জপধ্যান ও সাধনভজন নিয়া একনিষ্ঠভাবে থাকেন। ইহাঁরা সাধারণ বাঙালী বৈষ্ণবদের (যাঁহারা সেবাদাসী লইয়া থাকেন) সহিত মিশিতে চান না। এমন কি, আহার্য্যবস্তু স্পর্শ করিলেও তাঁহারা খাইতে চান না। ইহাঁরা হইলেন তাপস বৈষ্ণব। আমার সহিত কয়েকজনের বিশেষ আলাপ থাকায় আমি মাঝে মাঝে

এই স্থানটিতে যাইয়া বসিয়া থাকিতাম। স্থানটি অতি সুরম্য ও নিরিবিলি এবং চারিদিকে প্রশস্ত মাঠ থাকায় বায়ু অতি স্নিগ্ধকর। যাহা হউক, এই স্থানটিকে আমি প্রণাম করি। গোবর্দ্ধনের বাঙ্গালী বৈষ্ণবরাও এইরূপ বৈষ্ণব নামে খ্যাত এবং অতি সৎলোক। আমি কয়েকবার গোবর্দ্ধন গিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম।

শ্রীচৈতন্যের স্থান নির্ণয় করা যায় না

চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন ও মথুরায় গিয়াছিলেন তখন কোন্ কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, তখন বৃন্দাবন সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল। এইরূপ অট্টালিকাপূর্ণ নগর তখন হয় নাই। কেবলমাত্র 'চীরঘাটে' (বস্ত্রহরণের ঘাট) এক অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে তিনি বসিয়াছিলেন। ইহা হইল কিংবদন্তি। মথুরার কোন্ বাড়ীতে ছিলেন তাহাও নির্ণয় করা যায় না; কারণ, সহরের বাড়ীসকল নূতনভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যাহা হউক, উদ্দেশ করিয়া এই মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেও কল্যাণ হইবে।

পরিক্রমা

বৃন্দাবনের একটি বিশেষ প্রথা হইতেছে, পরিক্রমা। স্থানীয় লোকেরা বলে 'পারকম্মা'। কোন মন্দিরে যাইলে বিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনবার বা সাতবার মন্দিরকে পরিক্রমা করিতে হয়; অর্থাৎ, মন্দিরকে ডান দিকে রাখিয়া পরিক্রমা করিবে। পরি-

ক্রমার নিয়ম হইল, সেই সময় জপ করিতে হয়, অন্য কথা বা লোকের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই। এইটা হইল মন্দির পরিক্রমার কথা, কিন্তু বিশেষ প্রথা হইল বৃন্দাবন পরিক্রমা বা পঞ্চকোশী করা (বৃন্দাবনের পরিধি হইল পঞ্চক্রোশ)। এখন কিন্তু ততটা নাই, অল্প পরিসর হইয়া গিয়াছে। এই বৃন্দাবন পরিক্রমা করিলেই সব মন্দির পরিক্রমা করা হইল। একাদশীর দিন বহুসংখ্যক লোক পরিক্রমা করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে শুধু পায়ে বংশীবট হইতে পূর্ব্বদিক দিয়া জপ করিতে করিতে যাইতে হয়। যমুনার কিনারা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখন আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের নূতন সেবাশ্রমের প্রান্ত দিয়া যাত্রীরা পরিক্রমার পথ করিয়াছে। এইরূপে সেবাশ্রম পার হইয়া দানঘাট, রাজঘাট এইরূপ কয়েকটি স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্রশস্ত মাঠে পড়িতে হয়। এইখানে একটি ছোট লোকালয় আছে এবং কয়েকটি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব বাস করেন। তাহার পর পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকের মাঠ পার হইয়া বালির মাঠে পড়িতে হয়। এই স্থানে 'গোক্ষুর' একরকম কাঁটা বালির সঙ্গে মিশিয়া থাকে, সেটা বড় পায়ে লাগে ; তবে এই রকম কাঁটা তিন চারি রশি জমি মাত্র। মাঝে একটি শুকনো পাতকুয়া, এই পাতকুয়ার ভিতর মুখ দিয়া তিনবার "রাধেশ্যাম" বলিয়া শব্দ করিতে হয়। এই মাঠের কোন কোন জায়গায় তাপস সাধুও থাকেন। তাঁহারা দূর হইতে মাধুকরী করিয়া কিছু আহার্য্য লইয়া আসেন। অবশেষে পশ্চিমদিকে

গেলে একটি সুরম্য স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থানে কয়েকঘর হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব সাধু বাস করেন। তাঁহাদের ছোট ছোট ঠাকুরঘরও আছে। শুষ্ক বালির মাঠ পার হইয়া এই স্থানে আসিলে সহসা বৃক্ষাদি ও জল দেখিলে স্বতঃই মনটা প্রফুল্ল হইয়া ওঠে। সাধুরা বেশ সৎ লোক, তাঁহাদের অনেকের সহিত আমার জানাশুনা ছিল। এই স্থানটি পার হইলে পুনরায় যমুনার দিকে আসিতে হয়। তৎপরে যমুনার কিনারা দিয়া আসিয়া পুনরায় বংশীবটে আসিলে পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। অনেকেই গোপেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কার্য্য সমাধা করেন। এই হইল সাধারণ বৃন্দাবন পরিক্রমার কথা। আমি একবার মথুরায় রাণীঘাটে স্নান করিতেছিলাম; কোন্ মাসটা ঠিক মনে নাই, সম্ভবতঃ সন্ধ্যার শেষ সময়। তখন দেখিলাম যুগল-পরিক্রমার দিন পড়িয়াছে, অর্থাৎ বৃন্দাবন-মথুরা এক সঙ্গে পরিক্রমা। গরমীকালে একদিন, রাত্রে গোবর্দ্ধন পরিক্রমার প্রথা আছে। বহু সহস্র যাত্রী যাইয়া সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি গিরিরাজকে পরিক্রমা করে। এইরূপে বৃন্দাবন অঞ্চলে নানা রকম পরিক্রমার প্রথা আছে; তাহা বিশেষ উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। বৃন্দাবন পরিক্রমার সময় বড় ভাল লাগত; এইজন্য মাঝে মাঝে পরিক্রমা করিয়া আসিতাম। বৃন্দাবনে যমুনার ধারে চড়াতে অনেক হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব সাধু বাস করেন। তাঁহারা কুশ বা শরকাঠি ও মাটি দিয়া ছোট ছোট ঘর করেন। তাহাকে তাঁহারা কুটীর বলেন।

এই সকল সাধুকে বনবাসী সাধু বলে। ইঁহারা সহরবাসী সাধু হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্। একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ব্যাস কুটীরের মোহন্ত যিনি হইবেন তাঁহাকে 'ব্যাসজী' বলিয়া সম্বোধন করা হয়, এবং নারদকুটীরের যিনি মোহন্ত হইবেন তাঁহাকে 'নারদজী' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। লক্ষ্যের বিষয় এই যে অদ্যাপি এইরূপ সম্বোধনের রীতি প্রচলিত।

পাতকুয়া হইতে স্ত্রীলোকদের জল আনা

বৃন্দাবন নগরে বিশেষ ক'রে গ্রামসমূহে একটি বিশেষ দৃশ্য দেখা যায়। মথুরার সকল গ্রামে সাধারণতঃ ইঁদারা বা পাতকো থাকে না। তিন চারিখানি গ্রামের মধ্যে একটি করিয়া ইঁদারা থাকে। অর্থাৎ নিজ নিজ গ্রাম হইতে অনেক দূরে পানীয় জলের ইঁদারা পাওয়া যায়। তিন চারি খানি গ্রামের স্ত্রীলোক সকালে, বিশেষ করিয়া বিকালে ইঁদারায় জল আনিতে যায়। সকালের অপেক্ষা বিকালের দৃশ্যটি অতি সুন্দর হয়। গ্রামগুলি দূরে দূরে এবং বিভিন্ন দিকে। গ্রাম হইতে পাঁচ ছয়টি স্ত্রীলোক পায়ে চুট্‌কী, পাঁজোর ও তোড়া ইত্যাদি পরা, তারপর ঘাগরা, বুকে কাঁচুলী ও একখানা রঙিন ওড়না গায়ে ও মাথায় দেওয়া, নাকে ও অঙ্গুলিতে উপযুক্ত অলংকার আছে,—মাথায় একটি বিড়া দিয়া পিতলের বা মাটির গাগরি অর্থাৎ বড় বড় হাণ্ডা একটির পর একটি করিয়া তিনটি উপর উপর লইয়াছে। বাঁ-হাতে জল তোলবার বাল্‌তির মত একটি

জলপাত্র ও রসি এবং ডান হাতে আর একটি জলপাত্র। এইরূপ জলপাত্র মাথায় ও হাতে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে, তিন চারিখানি গ্রাম হইতে একটি ইঁদারার কাছে সকলে উপনীত হইল। গ্রাম থেকে ইঁদারা, বা ইঁদারা থেকে গ্রাম দেড় দুই মাইল হইবে। মাঝে মাঝে গরু চরিতেছে।

তিন চারিখানি গ্রাম হইতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া ইঁদারার ধারে মেলানি হইল, অর্থাৎ পরস্পরের কত কথা হইল। তারপর যে যার জলপাত্র পূর্ণ করিল। যে সব স্ত্রীলোকের জল পূর্ণ করা হইয়াছে তাহারা গ্রামে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। অপর স্ত্রীলোকেরা পাতকোয়ার বাঁধান পাড়ে ব'সে গল্প করিতে লাগিল।

তারপর প্রত্যাবর্ত্তন শোভাযাত্রা সুরু হইল। মাথায় তিনটি করিয়া জলকুম্ভ ও দু'হাতে দুইটি জলপাত্র লইয়া গল্প করিতে করিতে তাহারা একত্রে অগ্রসর হইতে লাগিল (বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়, এস্থলে পুরুষ বা বালক কেউ থাকিবে না)। তারপর তাহারা নিজ নিজ গ্রাম লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দিকে পৃথক্ হইল। গ্রামটি দূরে—দেখিতে ছোট হইয়া গিয়াছে। গরু সকল দূরে চরিতেছে ও ছোট ছোট দেখাইতেছে। দূরের গাছগুলি ছোট ছোট দেখিতে হইয়াছে ; তখন কাছের গাছ বড়। গুটিকতক স্ত্রীলোক ডানদিকে, দূরে নিজের গ্রামে চলিল ; বাঁদিকে কতক-গুলি দূরে পথ ধরিয়া নিজের গ্রামের দিকে চলিল। অপর দল সিধা পথ ধরিয়া দূরে নিজের গ্রামের দিকে চলিল। ক্রমে

স্ত্রীলোকদিগকে ছোট ছোট দেখিতে হইল এবং দূরে ছোট ছোট গ্রামে গৃহের ভিতর প্রবেশ করাতে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না। এদিকে অপরাহ্ণ ছ'টা সাড়ে ছ'টা হইয়াছে—সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়াছে। মাঠ যেন আলো করিয়া প্রান্তর দেবী পূর্ণ কুম্ভ মাথায় করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। সূর্য্যের তাপ কমিয়া আসিল। মাঠও ফাঁকা হইয়া গেল।

এ দৃশ্য কাছ হইতে দেখিতে নাই—দূর হইতে দেখিতে অতি সুন্দর। এটি কেবল বৃন্দাবন নগরে ও মথুরার গ্রামে দেখিয়াছি। অন্যত্র অতো স্মরণ হয় না। ইহা চিত্রকরের আলেখ্য অঙ্কনের বিশেষ উপকরণ। জনপ্রবাদ, যশোদা মাথায় করিয়া তিনটি জলপাত্র লইয়া যাইত। সেইজন্য অদ্যাপি মথুরার স্ত্রীলোকেরা মাথায় তিনটি জলপাত্র, ও দু'হাতে দুটি জলপাত্র লইয়া গল্প করিতে করিতে সুন্দর ভাবে যায়। এই সকল দেখিলে একটি অসীম দেবীভাব আসে। গাছের কাছে, দূরে, চারিদিকে এই চিত্র দেখিলে একটি দেব ভাব আসিয়া যায়। ইহা অতি মনোহর দৃশ্য। ভাগবতের গোপ-কন্যকার বর্ণনা এস্থলে এখনও দেখা যায়।

রাধাপ্রেম

তখন বরাহ নগরের মঠ প্রথম স্থাপিত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ একদিন প্রাতঃকালে রামতনু বসুর গলির বাড়ীতে আসিলেন।

সেই সময় তাঁহার এক সহপাঠী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া দুইজনে বসিলেন। আমি কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম। সহপাঠীর সহিত অনেক দিন পর সাক্ষাৎ হওয়ায় বেশ সাধারণ সখ্যভাবে কথাবার্ত্তা চলিল। সহপাঠী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই নরেন! রাধাপ্রেমটা কি? এটা কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে প্রণয় সেই জিনিষটা?" নরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ সাধারণ সখ্যভাবে কথা কহিতেছিলেন। কিন্তু যেই এই প্রশ্ন শুনিলেন অমনি তাঁহার সমস্ত মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। চক্ষুর দৃষ্টি ধীর, স্থির, মুখের ভাব অতি গম্ভীর, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও আজ্ঞাপ্রদ হইয়া উঠিল। স্বতন্ত্র আর একব্যক্তি দেহের ভিতর হইতে আবির্ভূত হইল; সাধারণ সখ্যভাব চলিয়া গিয়া উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট ভাব আসিল। নরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ছ্যাখ, গরুর যখন দুধ দোয়, বাঁটলোর ভেতর যে গ্যাঁজলা ওঠে সেই গ্যাঁজলাও অতি শক্ত, অতি কঠোর, তাতে আঙ্গুল কেটে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু রাধাপ্রেম দুধের গ্যাঁজলার চেয়েও অতি নরম। এত কোমল, এত পবিত্র, এত স্নিগ্ধ যে, সেটা দেহজ্ঞান থাকতে বোঝা যায় না। দেহজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে চ'লে গেলে আনন্দ ও লীলা কি, তা যদি কেউ উপলব্ধি ক'রতে পারে তাহ'লে মাত্র রাধাপ্রেমের আভাস পেতে পারে।"

সহপাঠী সাধারণ লোক, আপিসের কেরাণী; তাঁহার পক্ষে এই উদাহরণ অতি দুরূহ হইল। একটি ছোট মুখে হিমালয়

পাহাড় গেলা যেমন অসম্ভব, তাঁহার পক্ষেও এই ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করা তদ্রূপ মহা কঠোর হইয়া উঠিল। এদিকে নরেন্দ্রনাথ ভাবে বিভোর হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া মাথা দোলাইতে লাগিলেন, যেন ঘাড়ে মাথাটিকে আর রাখিতে পারিতেছিলেন না। কণ্ঠস্বর শ্লথ হইল এবং ঠোঁট দিয়া অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইতে লাগিল, এবং চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল,—যাহাকে বলে 'বিদেহ' অবস্থা। সেই অবস্থায় রাধা-ভাবের সহিত সংমিশ্রিত ও একীভূত হইয়া গেলেন। পূর্ব্বদেহ, পূর্ব্বমন, পূর্ব্ব-সংলগ্নভাব ইত্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, এক উচ্চস্তরে যাইয়া রাধাপ্রেম কি জিনিষ সেইটাই যেন মূর্ত্তিমানভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল চেষ্টা। ইহাকে বলে বিবর্ত্তন, অর্থাৎ স্নায়ু ও স্নায়ুর প্রক্রিয়া পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া স্বতন্ত্র মূর্ত্তি, স্বতন্ত্র ভাব, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর হইল। সহপাঠী এইরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণ থাকিবার পর আপিসে যাইতে হইবে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সহপাঠীর মুখ চোখ দেখিয়া বুঝা গেল যে, তিনি একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু যে আর সে লোক নয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যে কত পার্থক্য আছে তাহাও বুঝিতে পারিলেন। এটা হইল স্বামী বিবেকানন্দের রাধাপ্রেম উপলব্ধির কিঞ্চিৎ আভাস।

নিত্য ও লীলা

এখন নিত্য ও লীলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় ও শাশ্বত। লীলা নিত্যকে বিকাশ করিতেছে, আবরণ করিতেছে ও সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। একটা মত আছে, লীলাকে অনুধাবন করার পক্ষপাতী—নিত্যের জন্য বিশেষ প্রয়াস করিবার প্রয়োজন নাই। লীলাই হইতেছে মাধুর্য্য, লীলাই হইতেছে বিকাশক এবং লীলাই পরিচায়ক। এই লীলা বুঝিতে পারিলে নিত্য আপনি আসিবে। এই মতাবলম্বীরা বলেন ঃ

"রাধে রাধে রাধে বল মন।
রাধার কৃপা পেলে পাবে কৃষ্ণদরশন ॥

লীলা বুঝিতে হইলে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন আসে যে, কাহার লীলা ? অর্থাৎ কর্ত্তা কে ?—নিত্যের সহিত লীলার শাশ্বত সম্বন্ধ। তবে মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া নিত্যকে পাইতে হইলে লীলার প্রাধান্য দিতে হয়। লীলা অর্থে বুঝায়, যাহা কিছু বিকাশ হইয়াছে, যাহা ক্রিয়াশীল ও নিত্যের পরিচায়ক। এইজন্য লীলা, সমস্ত বিকাশক-বস্তু বা ভাব বা ক্রিয়াকে বলা যাইতে পারে। এই লীলার কোন পরিধি করা যায় না। ইহা হইল পরিধি বিবর্জ্জিত, সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত এবং নিত্য হইতে অবিচ্ছিন্ন। কেবলমাত্র এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, 'নিত্য'—শাশ্বত, স্থির, গম্ভীর ও অপরিবর্ত্তনীয়। 'লীলা' হইল চাঞ্চল্যের ভিতর নিশ্চল, বিপরীত ভাবের ভিতর মাধুর্য্য,

কঠোরতার ভিতর কোমল বা স্নেহভাব। এই যে চাঞ্চল্যের ভিতর স্থিরভাব ও কঠোরতার ভিতর মাধুর্য্য, এইটিই হইল বিশেষ বুঝিবার বিষয়। এইজন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে নিত্য অপেক্ষা লীলার এত মহিমা ব্যাখ্যা হইয়াছে। অপরদিকে লীলা হইল আবরণীশক্তি, নিত্যকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। লীলার ভিতর দিয়া না গেলে নিত্যের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। ভক্তিগ্রন্থে তাই লীলার এত প্রাধান্য। লীলা হইল আর এক ভাবের হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। ঐ ত্রিবিধভূতা শক্তির কার্য্যই হইতেছে লীলা।

"আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

নিরানন্দে থাকিলে 'হ্লাদিনী শক্তি' চিত্তকে দৃঢ় করিয়া মাধুর্য্যভাব দিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া দেয়। এই শক্তি সহায়ে ভগবান স্বয়ং আহ্লাদিত হয়েন এবং জগদ্বাসীকে আহ্লাদিত করিয়া থাকেন। আনন্দ ও মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া মনকে উচ্চদিকে লইয়া যাওয়া হ্লাদিনীর কার্য্য।

দ্বিতীয় ভাব হইল 'সন্ধিনী'—নিত্যে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকা। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, এই সন্ধিনীভাবেই সব সত্ত্বাবান। আবরণী—শুশ্রূষা, সেবা, পালন বা রক্ষণ ইত্যাদি সব ভাবেতে আবরণ করিয়া রাখিতেছে, এইজন্য ইহাকে নিত্যসন্ধিনী বলা হয়।

তৃতীয় ভাবটি হইল 'সম্বিৎ'। মাধুর্য্যপূর্ণ ভাব সব সময়

আবরণ ও আচ্ছাদন করিয়া থাকায় চিত্ত অজ্ঞাতসারে উচ্চ জ্ঞানমার্গে চলিয়া যায়। অর্থাৎ, নিত্য বা শাশ্বত জ্ঞানেতে অলক্ষিতে উপনীত হয়। সম্বিৎ পূর্ণজ্ঞানের অবস্থা। এই আবরণীশক্তি সব সময় অবিচ্ছিন্নভাবে থাকায় মনের গতি নিম্নদিকে না যাইয়া উচ্চস্তরে যায় এবং স্বভাবতঃ অজ্ঞাতসারে পূর্ণজ্ঞান আসে। এইজন্য লীলাকে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ বলা হয়।

আর একটি কথা হইল, কিরূপে নিত্য ও লীলাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে? প্রথম হইল 'সামীপ্য'—সন্নিকটে আছে, কিন্তু পৃথক্‌ভাব ও অনিশ্চিত ভাব। তদূর্দ্ধে মন উঠিলে, 'সালোক্য'—একক্ষেত্রে বা ভূমিতে (আসনে) ইষ্ট ও চিত্ত উভয়ে উপবেশন করিয়া আছে, কিন্তু পৃথক্ অর্থাৎ অনেকটা ঘনিষ্টভাব তবু পার্থক্য। তদূর্দ্ধে মন উঠিলে, 'সাযুজ্য'—পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। এখন ভয়ের কারণ আর নাই। উঁচু নীচু, মহান ক্ষুদ্র, এই ভাবটা চলিয়া গিয়াছে; ইষ্ট বা বল্লভকে স্পর্শ করা যাইতে পারে। একদিকে এও যেমন একটা বিকাশের ভাব অপরদিকে হইল, স্থূল-দেহ পরিহার করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহেতে মন উপনীত হইয়াছে। সেইজন্য কারণ কারণকে অনুসন্ধান করিতেছে এবং সংযুক্ত হইতে প্রয়াস পাইতেছে। ইহা স্থূলদেহের জ্ঞান থাকিতে হয় না। এই সংযুক্তভাবটি হইল কারণ-দেহের কথা। তদূর্দ্ধে মন উঠিলে 'সারূপ্য' অবস্থা—এক হইল অপরের প্রতিবিম্ব। দ্রষ্টা হইল দ্রষ্টব্যের প্রতিবিম্ব। দ্রষ্টব্য হইল দ্রষ্টার প্রতিবিম্ব। এইস্থলে

চিত্ত কারণ-শরীর হইতে মহাকারণের দিকে চলিয়া যায়। দেহজ্ঞান, স্থূলজ্ঞান, জগতের জ্ঞান, কাল বা নিমিত্তের জ্ঞান এইসব ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া কেবলমাত্র মহাকারণ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণ করিতেছে।

"নীরবে বসিয়া রব তথা
মুখে নাই একটিও কথা।"

তদূর্দ্ধে মন উঠিলে আর এক অবস্থার কথা উল্লেখ আছে, তাহাকে বলে 'সাঞ্চিষ্ট'—এই স্থলে দুইটি সত্ত্বা আছে, কিন্তু এক। এক সত্ত্বা অপরের অবয়ব মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছে, অর্থাৎ সত্ত্বা এক, আবরণ দুই। সত্ত্বা কখনও এক আবরণ হইতে অপর আবরণে যাইতেছে এবং অপর আবরণ হইতে পূর্ব্ব আবরণে আসিতেছে। আবরণের পার্থক্য আছে কিন্তু সত্ত্বা এক। "তুমি আমার, আমি তোমার একাধারে হইব।" অথবা

"যেদিকেতে চাই নয়ন ফিরাই,
তব মুখছবি দেখিতে যে পাই॥"

তদূর্দ্ধে মন উঠিলে কিন্তু অপর প্রকার হয়। পূর্ব্ব অবস্থায় যদিও সত্ত্বা এক—আবরণী পৃথক্ কিন্তু এই 'সার্ষ্টি' বা ষষ্ঠ অবস্থায়, অর্থাৎ অভেদাত্ম স্তরে মন উঠিলে সবই একীভূত হইয়া যায়। এইজন্য এই অবস্থায় যাহা হয় তাহার কোন গ্রন্থে বর্ণনা নাই। কারণ ইহা প্রকাশ করিবার কথা নয়—নিমজ্জিত ও একীভূত হইয়া যাইবার কথা। এই হইল সাধারণভাবে

নিত্য ও লীলার কিঞ্চিৎ আভাস। ইহা ভাষা ও তর্ক-বিতর্ক দ্বারা বুঝাইবার বিষয় নহে। অস্পষ্ট, অসঙ্গত, ভ্রান্তিপূর্ণ, প্রকৃত বস্তুর কিঞ্চিৎ সাঙ্কেতিক আভাস; কিন্তু প্রকৃত বস্তু বহু উর্দ্ধে।

শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য লীলাভাবটি প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জনসাধারণের ভিতর তাঁহার এই উচ্চ আদর্শ 'হ্লাদিনীভাব' বিকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা হইল মাধুর্য্যপূর্ণ, কবিত্বপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণভাব যা তাঁহার ধর্ম্মে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য এই ভাবটি বিকাশ করিবার জন্য কখনও বা নিত্যরূপী হইতেন অর্থাৎ নিত্যভাবে অধিষ্ঠান করিতেন, কখনও বা স্বয়ং লীলারূপী হইয়া নিত্যের ভাব আস্বাদন করিতেন। নিত্য কি করিয়া লীলাকে দর্শন করে ও ভাব উপলব্ধি করে, এবং লীলা কি করিয়া নিত্যকে দর্শন ও ভাব সম্ভোগ করে, এইটি তিনি রূপান্তর করিয়া নিজে উপভোগ ও বিকাশ করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে বলিত 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ রাধা'। সাধারণ কাব্যে যেরূপ নায়ক ও নায়িকা থাকে, এবং রচয়িতা কখনও নায়িকার প্রাধান্য দর্শায় ও মুখ্য করিয়া দেয় এবং নায়ককে গৌণ করে কখনও বা আবার নায়ককে মুখ্য করে ও নায়িকাকে গৌণ করে, সেইরূপ চৈতন্য তাঁহার ভাবপুঞ্জের ভিতর কখনও লীলাকে প্রাধান্য কখনও বা নিত্যকে প্রাধান্য

দিতেন। যখন যে ভাবে ভাবিত হইতেন তখন সে ভাবে তিনি পরিপূর্ণ ও আপ্লুত হইয়া যাইতেন। এই ভাবাবেশকালে তাঁহার পদবিক্ষেপ, নেত্রের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিষ্ঠান, হস্ত-সঞ্চালন, গ্রীবা ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পূর্ণ উচ্চভাবের বা অমানুষিক ভাবের হইয়া যাইত। ঠিক যেন ধ্যেয়ভাবটি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া প্রতিফলিত হইত। ইহাকে বলে ভাবময় তনু; ভাবই হইতেছে তনু,—তনু বিকাশ করিতেছে ভাবকে,—ভাব বিকাশ করিতেছে তনুকে। এক হইল অপরের প্রতিবিম্ব ও অভিন্ন। ইহাকে বলে মাধুর্য্যপরিপূর্ণভাব। ইহা ভাষা দিয়া প্রকাশ করিবার নয়, বিশেষভাবে ধ্যানের ও চিন্তার বিষয়। কারণ, চৈতন্যের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রতি অঙ্গুলি সঞ্চালন, কণ্ঠস্বর, নেত্রদৃষ্টি, প্রত্যেক অবয়বের ভাবভঙ্গী সম্পূর্ণ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি মাধুর্য্যের পূর্ণ বিগ্রহ ছিলেন।

কবিত্বশক্তি কি ?

এই মাধুর্য্যকে, এই আনন্দময়ধামে নীয়মান পন্থাকে উচ্চ অঙ্গের কবিতা বলে। উচ্চ অঙ্গের কবিতার উদ্দেশ্য হইল দেহজ্ঞান বিবর্জ্জন করিয়া চিত্তকে আনন্দময়ধামে উপনীত করা। আনন্দ আনন্দকে অন্বেষণ করে। আনন্দে আনন্দ মিশ্রিত ও নিমজ্জিত হয়। কবিত্বশক্তি, হ্লাদিনীশক্তি কি তাহা যদি বুঝিবার প্রয়াস করা যায় তবে শ্রীচৈতন্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তিনি কবি ছিলেন না, কবিত্বশক্তির বিগ্রহরূপে ভূতলে বিচরণ

করিয়াছিলেন। কবিত্বশক্তির মূর্ত্তিমান প্রতীক। এইজন্য চলতি কথায় বলিতে হইলে শ্রীচৈতন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। কারণ, মাধুর্য্যবিকাশই হইল কবিত্বশক্তির প্রধান উদ্দেশ্য, এবং শ্রীচৈতন্য হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ এই তিনভাবের বিশেষ করিয়া মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। অপরদিক হইতে তাঁহাকে যেমন বর্ণনা করা যাইতে পারে, এই উচ্চাঙ্গের হ্লাদিনী কবিত্বশক্তি দিয়াও তাঁহাকে সেইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে এবং তাঁহার বিষয়ে যিনি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন সবই ঠিক। কারণ, এই সব বস্তু এত উচ্চাঙ্গের যে, সকল কথায়ই ঠিক ঠিক প্রয়োজ্য হয়, কোনটাই ভূল হয় না। এইজন্য শ্রীচৈতন্যকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বা কবিতার জীবন্ত প্রতীক বলা হইল, কারণ, তাঁহার ধর্ম্ম ও মনোভাব এত কোমল ও কবিত্বপূর্ণ ছিল যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করা দুরূহ। দেহজ্ঞান বিবর্জ্জিত ভাবে আত্মায় আত্মায় মিলনের যে মাধুর্য্য হয় তাহাকে কবিত্বশক্তি বলে। শ্রীচৈতন্য কবিত্বশক্তির নূতনভাব দেখাইয়াছিলেন ও নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দেহজ্ঞান বিবর্জ্জিত—আত্মায় আত্মায় মিলন। একজন আশ্রয় দিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ, একজন আশ্রয় পাইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ, অধিক আর আকাঙ্ক্ষা নাই—আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ দর্শনের ফলই হইল কৃষ্ণ দর্শন"—(বিল্বমঙ্গল)। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল এবং সমস্তই পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত হইল। অপূর্ণভাব চলিয়া গেল, পূর্ণভাব আসিল। শ্রীচৈতন্য ভাব ও কবিত্বশক্তিকে

অতি উচ্চভাবে উপনীত করিয়া জগৎকে দর্শাইয়াছিলেন। তিনি জগতে শ্রেষ্ঠ কবি এবং উচ্চ কবিত্বশক্তির প্রতিমূর্ত্তি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যদিও শ্রীচৈতন্য কবি বলিয়া জগতে তেমন প্রতিপন্ন হন নাই কিন্তু তিনি কবিতার জীবন্ত বিগ্রহ হইয়া ধরাধামে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত সঞ্চালন, পদবিক্ষেপ; অঙ্গভঙ্গী, চক্ষের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর সমস্তই মাধুর্য্য-পূর্ণ ছিল। এইজন্য তিনি কবি না হইয়া প্রত্যক্ষ কবিত্বশক্তি হইয়া গিয়াছিলেন। বুদ্ধ ও শঙ্কর-প্রভাবে দার্শনিক মতের বিশেষ বাহুল্য হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যপ্রভাবে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তির বিশেষ প্রসারণ হয়। কোমল, স্নেহপূর্ণ, মাধুর্য্যপূর্ণ কবিতা, যাহাকে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ বলা যায় বৈষ্ণব কবিতাতে তাহা বহু পরিমানে দৃষ্ট হয়। মাধুর্য্যপূর্ণ, নিঃস্বার্থ প্রেমের কবিতায় বৈষ্ণব কবিগণ জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ, কোমল ও মাধুর্য্যপূর্ণ কবিতা অন্যত্র তেমন পাওয়া যায় না।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি শিব ওঁ।